ব্যোমকেশের ডায়েরী

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩·১·১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা·৬

দুই টাকা আট আনা

চতুর্থ মুদ্রণ
চৈত্র—১৩৫৯

উৎসর্গ

মান্টু ও মিহির

অনেকে জানিতে চাহেন আমার এ গল্পগুলি কোনো বিদেশী গল্পের নকল কি না। সাধারণের অবগতির জন্য জানাইতেছি যে এগুলি আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনা।

ডিটেক্‌টিভ গল্প সম্বন্ধে অনেকের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আছে—যেন উহা অন্ত্যজ শ্রেণীর সাহিত্য। আমি তাহা মনে করি না। Edgar Allan Poe, Conan Doyle, G. K. Chesterton যাহা লিখিতে পারেন তাহা লিখিতে অন্ততঃ আমার লজ্জা নাই।

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

সত্যান্বেষী

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সন তেরশ একত্রিশ সালে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি শেষ করিয়া সবেমাত্র বাহির হইয়াছি। পয়সার বিশেষ টানাটানি ছিল না, পিতৃদেব ব্যাঙ্কে যে টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সুদে আমার একক জীবনের খরচা কলিকাতার মেসে থাকিয়া বেশ ভদ্রভাবেই চলিয়া যাইত। তাই স্থির করিয়াছিলাম কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করিয়া সাহিত্যচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিব। প্রথম যৌবনের উদ্দীপনায় মনে হইয়াছিল, একান্তভাবে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যে অচিরাৎ যুগান্তর আনিয়া ফেলিব। এই সময়টাতে বাঙালীর সন্তান অনেক ভাল ভাল স্বপ্ন দেখে,—যদিও সে-স্বপ্ন ভাঙিতেও বেশী বিলম্ব হয় না!

কিন্তু ও কথা যাক। ব্যোমকেশের সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল এখন তাহাই বলি।

যাঁহারা কলিকাতা সহরের সহিত ঘনিষ্টভাবে পরিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে হয়ত জানেন না যে এই সহরের কেন্দ্রস্থলে এমন একটি পল্লী আছে, যাহার এক দিকে দুঃস্থ ভাটিয়া-মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের বাস, অন্য দিকে খোলার বস্তি এবং তৃতীয় দিকে তির্য্যক্‌চক্ষু পীতবর্ণ চীনাদের উপনিবেশ। এই ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্যস্থলে যে 'ব'-দ্বীপটি সৃষ্টি হইয়াছে, দিনের কর্ম্ম-কোলাহলে তাহাকে দেখিয়া একবারও মনে হয় না যে ইহার কোনও অসাধারণত্ব বা অস্বাভাবিক বিশিষ্টতা আছে। কিন্তু সন্ধ্যার

পরেই এই পল্লীতে এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করে। আটটা বাজিতে না বাজিতেই দোকানপাট সমস্ত বন্ধ হইয়া পাড়াটা একবারে নিস্তব্ধ হইয়া যায়; তখন কেবল দূরে দূরে দু'একটা পান বিড়ির দোকান খোলা থাকে মাত্র। সে সময় যাহারা এ অঞ্চলে চলাফেরা করিতে আরম্ভ করে, তাহারা অধিকাংশই নিঃশব্দে ছায়ামূর্ত্তির মত সঞ্চরণ করে এবং যদি কোনও অজ্ঞ পথিক অতর্কিতে এ পথে আসিয়া পড়ে সে-ও দ্রুতপদে যেন সন্ত্রস্তভাবে ইহার এলাকা অতিক্রম করিয়া যায়।

আমি কি করিয়া এই পাড়াতে আসিয়া এক মেসের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহা বিশদ করিয়া লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, দিনের বেলা পাড়াটা দেখিয়া মনে কোনও প্রকার সন্দেহ হয় নাই এবং মেসের দ্বিতলে একটি বেশ বড় হাওয়াদার ঘর খুব সস্তায় পাইয়া বাক্যব্যয় না করিয়া তাহা অধিকার করিয়াছিলাম। পরে যখন জানিতে পারিলাম যে, এই পাড়ায় মাসের মধ্যে দুই তিনটি মৃতদেহ ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায় এবং নানা কারণে সপ্তাহে অন্ততঃ একবার করিয়া পুলিস-রেড্ হইয়া থাকে, তখন কিন্তু বাসাটার উপর এমন মমতা জন্মিয়া গিয়াছে যে, আবার তল্পিতল্পা তুলিয়া নূতন বাসায় উঠিয়া যাইবার প্রবৃত্তি নাই। বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর আমি নিজের লেখাপড়ার কাজেই নিমগ্ন হইয়া থাকিতাম, বাড়ীর বাহির হইবার কোনও উপলক্ষ ছিল না; তাই ব্যক্তিগতভাবে বিপদে পড়িবার আশঙ্কা কখনও হয় নাই।

আমাদের বাসার উপর-তলায় সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচটি ঘর ছিল, প্রত্যেকটিতে একজন করিয়া ভদ্রলোক থাকিতেন। তাঁহারা সকলেই চাকরীজীবী এবং বয়স্থ; শনিবারে শনিবারে বাড়ী যাইতেন, আবার সোমবারে ফিরিয়া অফিস যাতায়াত আরম্ভ করিতেন। ইহারা অনেক দিন হইতে এই মেসে

বাস করিতেছেন। সম্প্রতি একজন কাজ হইতে অবসর লইয়া বাড়ী চলিয়া যাওয়াতে তাঁহারই শূন্য ঘরটা আমি দখল করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার পর তাসের বা পাশার আড্ডা বসিত—সেই সময় মেসের অধিবাসিদের কণ্ঠস্বর উত্তেজনা কিছু উগ্রভাব ধারণ করিত। অশ্বিনী বাবু পাকা খেলোয়াড় ছিলেন,—তাঁহার অস্থায়ী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন ঘনশ্যাম বাবু। ঘনশ্যাম বাবু হারিয়া গেলে চেঁচামেচি করিতেন। তার পর ঠিক নয়টার সময় বামুন ঠাকুর আসিয়া জানাইত যে আহার প্রস্তুত; তখন আবার ইঁহারা শান্তভাবে উঠিয়া আহার সমাধা করিয়া যে যাহার ঘরে শুইয়া পড়িতেন। এইরূপ নিরুদ্ঘাত শান্তিতে মেসের বৈচিত্র্যহীন দিনগুলি কাটিতেছিল; আমিও আসিয়া নির্ব্বিবাদে এই প্রশান্ত জীবনযাত্রা বরণ করিয়া লইয়াছিলাম।

বাসার নীচের তলার ঘরগুলি লইয়া বাড়ীওয়ালা নিজে থাকিতেন। ইনি একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার—নাম অনুকূল বাবু। বেশ সরল সদালাপী লোক। বোধ হয় বিবাহ করেন নাই, কারণ, বাড়ীতে স্ত্রী পরিবার কেহ ছিল না। তিনি মেসের খাওয়া-দাওয়া ও ভাড়াটেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন পরিপাটীভাবে তিনি সমস্ত কাজ করিতেন যে, কোনও দিক্ দিয়া কাহারও অনুযোগ করিবার অবকাশ থাকিত না, মাসের গোড়ায় বাড়ীভাড়া ও খোরাকী বাবদ পঁচিশ টাকা তাঁহার হাতে ফেলিয়া দিয়া সকল বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যাইত।

পাড়ার দরিদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তারের বেশ পসার ছিল। সকালে ও বিকালে তাঁহার বসিবার ঘরে রোগীর ভিড় লাগিয়া থাকিত। তিনি ঘরে বসিয়া সামান্য মূল্যে ঔষধ বিতরণ করিতেন। রোগীর বাড়ীতে বড় একটা যাইতেন না, গেলেও ভিজিট লইতেন না। এই জন্য পাড়া-প্রতিবাসী সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত খাতির ও শ্রদ্ধা করিত। আমিও

অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার ভারি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। বেলা দশটার মধ্যে মেসের অন্যান্য সকলে অফিসে চলিয়া যাইত, বাসায় আমরা দুই জনে পড়িয়া থাকিতাম। স্নানাহার প্রায় একসঙ্গেই হইত, তার পর দুপুরবেলাটাও গল্পে-গুজবে সংবাদপত্রের আলোচনায় কাটিয়া যাইত। ডাক্তার অত্যন্ত নিরীহ ভালমানুষ লোক হইলেও ভারি চমৎকার কথা বলিতে পারিতেন। বয়স বছর চল্লিশের ভিতরেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও উপাধিও তাঁহার ছিল না, কিন্তু ঘরে বসিয়া এত বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান তিনি অর্জ্জন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার কথা শুনিতে শুনিতে বিস্ময় বোধ হইত। বিস্ময় প্রকাশ করিলে তিনি লজ্জিত হইয়া বলিতেন,—"আর ত কোনও কাজ নেই, ঘরে ব'সে কেবল বই পড়ি! আমার যা কিছু সংগ্রহ সব বই থেকে।"

এই বাসায় মাস দুই কাটিয়া যাইবার পর একদিন বেলা আন্দাজ দশটার সময় আমি ডাক্তার বাবুর ঘরে বসিয়া তাঁহার খবরের কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিলাম। অশ্বিনী বাবু পান চিবাইতে চিবাইতে অফিস চলিয়া গেলেন; তার পর ঘনশ্যাম বাবু বাহির হইলেন, দাঁতের ব্যথার জন্য এক পুরিয়া ঔষধ ডাক্তার বাবুর নিকট হইতে লইয়া তিনিও অফিস যাত্রা করিলেন। বাকী দুই জনও একে একে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সারা দিনের জন্য বাসা খালি হইয়া গেল।

ডাক্তার বাবুর কাছে তখনও দু'একজন রোগী ছিল, তাহারা ঔষধ লইয়া একে একে বিদায় হইলে পর তিনি চশমাটা কপালে তুলিয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাগজে কিছু খবর আছে না কি?"

"কাল বৈকালে আমাদের পাড়ায় পুলিসের খানাতল্লাসী হ'য়ে গেছে।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"সে ত নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। কোথায় হ'ল?"

"কাছেই—ছত্রিশ নম্বরে। শেখ আবদুল গফুর ব'লে একটা লোকের বাড়ীতে।"

ডাক্তার বলিলেন,—আরে, লোকটাকে যে আমি চিনি, প্রায়ই আমার কাছে ওষুধ নিতে আসে।—কি জন্যে খানাতল্লাসী হয়েছে, কিছু লিখেছে ?"

"কোকেন। এই যে পড়ুন না!" বলিয়া আমি 'দৈনিক কালকেতু' তাঁহার দিকে আগাইয়া দিলাম।

ডাক্তার চশমা-জোড়া পুনশ্চ নাসিকার উপর নামাইয়া পড়িতে লাগিলেন,—

"গতকল্য—অঞ্চলে ছত্রিশ নং—ষ্ট্রীটে সেখ আবদুল গফুর নামক জনৈক চর্ম্মব্যবসায়ীর বাড়ীতে পুলিসের খানাতল্লাসী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কোনও বে-আইনী মাল পাওয়া যায় নাই। পুলিসের অনুমান, এই অঞ্চলে কোথাও একটি কোকেনের গুপ্ত আড়ত আছে, সেখান হইতে সর্ব্বত্র কোকেন সরবরাহ হয়। এক দল চতুর অপরাধী পুলিসের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বহুদিন যাবৎ এই আইন-বিগর্হিত ব্যবসায় চালাইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই অপরাধীদের নেতা কে এবং ইহাদের গুপ্তভাণ্ডার কোথায়, তাহা বহু অনুসন্ধানেও নির্ণয় করা যাইতেছে না।"

ডাক্তার একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"কথাটা ঠিক। আমারও সন্দেহ হয়, কাছে-পিঠে কোথাও কোকেনের একটা মস্ত আড্ডা আছে। দু'একবার তার ইসারা আমি পেয়েছি,—জানেন ত নানা রকম লোক ওষুধ নিতে আমার কাছে আসে। আর যাই করুক, যে কোকেনখোর, সে ডাক্তারের কাছে কখনও আত্মগোপন করতে পারে না।—কিন্তু ঐ আবদুল গফুর লোকটাকে ত আমার কোকেনখোর ব'লে মনে হয় না! বরং সে যে পাকা আফিংখোর একথা জোর ক'রে বলতে পারি। সে নিজেও সে কথা গোপন করে না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, অনুকূল বাবু, এ পাড়ায় যে এত খুন হয়, তার কারণ কি?"

ডাক্তার বলিলেন,—"তার ত খুব সহজ কারণ রয়েছে। যারা গোপনে আইন ভঙ্গ ক'রে একটা বিরাট ব্যবসা চালাচ্ছে, তাদের সর্ব্বদাই ভয়—পাছে ধরা পড়ে। সুতরাং দৈবক্রমে যদি কেউ তাদের গুপ্তকথা জানতে পেরে যায়, তখন তাকে খুন করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। ভেবে দেখুন, আমি যদি কোকেনের ব্যবসা করি আর আপনি যদি দৈবাৎ সে কথা জানতে পেরে জান, তা হ'লে আপনাকে বাঁচ্‌তে দেওয়া আমার পক্ষে আর নিরাপদ হবে কি? আপনি যদি কথাটি পুলিসের কাছে ফাঁস করে দেন, তা হ'লে আমি ত জেলে যাবই, সঙ্গে সঙ্গে এতবড় একটা ব্যবসা ভেঙ্গে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকার মাল বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। আমি তা হ'লে দিতে পারি?"—বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম,—"আপনি অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব বেশ অনুশীলন করেছেন দেখছি!"

"হ্যাঁ। ও দিকে আমার খুব ঝোঁক আছে।" বলিয়া আড়ামোড়া ভাঙিতে ভাঙিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

আমিও উঠি-উঠি করিতেছি, এমন সময় একটি লোক আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বয়স বোধ করি তেইশ-চব্বিশ হইবে, দেখিলে শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়া মনে হয়। গায়ের রং ফরসা, বেশ সুশ্রী সুগঠিত চেহারা,—মুখে চোখে বুদ্ধির একটা ছাপ আছে। কিন্তু বোধ হয়, সম্প্রতি কোনও কষ্টে পড়িয়াছে; কারণ, বেশভূষার কোনও যত্ন নাই, চুলগুলি অবিন্যস্ত, গায়ের কামিজটা ময়লা, এমন কি পায়ের জুতা-জোড়াও কালীর অভাবে রুক্ষভাব ধারণ করিয়াছে। মুখে একটা উৎকণ্ঠিত আগ্রহের ভাব। আমার দিক্ হইতে অনুকূল বাবুর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"শুনলুম এটা একটা মেস্,—যায়গা খালি আছে কি?"

ঈষৎ বিস্ময়ে আমরা দু'জনেই তাহার দিকে চাহিয়াছিলাম, অনুকূল মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না। মশায়ের কি করা হয়?"

লোকটি ক্লান্তভাবে রোগীর বেঞ্চের উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল,—"উপস্থিত চাকরীর জন্যে দরখাস্ত দেওয়া হয় আর মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা খোঁজা হয়। কিন্তু এই হতভাগা সহরে একটা মেসও কি খালি পাবার যো নেই—সব কানায় কানায় ভর্ত্তি হয়ে আছে।"

সহানুভূতির স্বরে অনুকূল বাবু বলিলেন,—"সীজ্‌নের মাঝখানে মেসে বাসায় যায়গা পাওয়া বড় মুস্কিল। মশায়ের নামটি কি?"

"অতুলচন্দ্র মিত্র। কলকাতায় এসে পর্য্যন্ত চাকরীর সন্ধানে টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি। দেশে ঘটী-বাটি বিক্রী ক'রে যে-ক'টা টাকা এনেছিলুম, তাও প্রায় শেষ হয়ে এল,—গুটি পঁচিশ-ত্রিশ বাকী আছে। কিন্তু দু'বেলা হোটেলে খেলে সেও আর কদ্দিন বলুন? তাই একটি ভদ্রলোকের মেস খুঁজছি—বেশী দিন নয়, মাসখানেকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে—এই ক'টা দিনের জন্যে দু'বেলা দুটো শাকভাত আর একটু যায়গা পেলেই আর আমার কিছু দরকার নেই।"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"বড় দুঃখিত হলাম অতুল বাবু, কিন্তু আমার এখানে সব ঘরই ভর্ত্তি।"

অতুল একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"তবে আর উপায় কি বলুন—আবার বেরুই। দেখি যদি উড়েদের আড্ডায় একটু যায়গা পাই।—আর ত কিছু নয়, ভয় হয়, রাত্তিরে ঘুমুলে হয় ত টাকাগুলো সব চুরি ক'রে নেবে।—এক গেলাস জল খাওয়াতে পারেন?"

ডাক্তার জল আনিতে গেলেন। লোকটির অসহায় অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দয়া হইল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম,—"আমার ঘরটা বেশ বড় আছে—দু'জনে থাকলে অসুবিধা হবে না। তা—আপনার যদি আপত্তি না থাকে—"

অতুল লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"আপত্তি? বলেন কি মশায়,—স্বর্গ হাতে পাব।" তাড়াতাড়ি ট্যাঁক হইতে কতকগুলা নোট ও টাকা বাহির করিয়া বলিল,—"কত দিতে হবে? টাকাটা আগাম নিয়ে নিলে ভাল হ'ত না? আমার কাছে আবার—"

তাহার আগ্রহ দেখিয়া আমি হাসিয়া বলিলাম,—"থাক, টাকা পরে দেবেন অখন—তাড়াতাড়ি কিছু নেই—" ডাক্তার বাবু জল লইয়া ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাকে বলিলাম,—"ইনি সঙ্কটে পড়েছেন তাই আপাতত আমার ঘরেই না হয় থাকুন—আমার কোনও কষ্ট হবে না।"

অতুল কৃতজ্ঞতাগদ্‌গদ স্বরে বলিল,—"আমার ওপর ভারি দয়া করেছেন ইনি! কিন্তু বেশী দিন আমি কষ্ট দেব না—ইতিমধ্যে যদি অন্য কোথাও যায়গা পেয়ে যাই, তা হ'লে সেখানেই উঠে যাব।" বলিয়া জলপানান্তে গেলাসটা নামাইয়া রাখিল।

ডাক্তার একটু বিস্মিতভাবে আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"আপনার ঘরে? তা—বেশ। আপনার যখন অমত নেই, তখন আমি কি বলব? আপনার সুবিধাও হবে—ঘর-ভাড়াটা ভাগাভাগি হয়ে যাবে—"

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম,—"সে জন্যে নয়—উনি বিপদে পড়েছেন—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"সে ত বটেই।—তা আপনি আপনার জিনিষপত্র নিয়ে আসুন গে, অতুল বাবু। এইখানেই আপাততঃ থাকুন।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। জিনিষপত্র সামান্যই—একটা বিছানা আর ক্যাম্বিসের ব্যাগ। এক হোটেলের দরোয়ানের কাছে রেখে এসেছি—এখনই নিয়ে আসছি।"

আমি বলিলাম,—"হ্যাঁ—স্নানাহার এখানেই করবেন।"

"তা হ'লে ত ভালই হয়।"—কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া অতুল বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া গেলে আমরা কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলাম। অনুকূল বাবু অন্যমনস্ক ভাবে কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ পরিষ্কার করিতে লাগিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ভাবছেন ডাক্তার বাবু?"

ডাক্তার চমক ভাঙিয়া বলিলেন,—"কিছু না।—বিপন্নকে আশ্রয় দেওয়া উচিত, আপনি ভালই করেছেন। তবে কি জানেন—'অজ্ঞাত-কুলশীলস্য'—শাস্ত্রের একটা বচন আছে—। যাক্, আশা করি, কোনও ঝঞ্ঝাট উপস্থিত হবে না।" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন।

অতুল মিত্র আমার ঘরে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। অনুকূল বাবুর কাছে একটা বাড়্তি তক্তপোষ ছিল, তিনি সেখানা অতুলের ব্যবহারের জন্য উপরে পাঠাইয়া দিলেন।

অতুল দিনের বেলায় বড় একটা বাসায় থাকিত না। সকালে উঠিয়া চাকরীর সন্ধানে বাহির হইয়া যাইত, বেলা দশটা এগারোটার সময় ফিরিত; আবার স্নানাহারের পর বাহির হইত। কিন্তু যতটুকু সময় সে বাসায় থাকিত, তাহারই মধ্যে বাসার সকলের সঙ্গে বেশ সম্প্রীতি জমাইয়া তুলিয়াছিল। সন্ধ্যার পর খেলার মজলিশে তাহার ডাক পড়িত। কিন্তু সে তাস—পাশা খেলিতে জানিত না, তাই কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া আস্তে আস্তে নীচে নামিয়া গিয়া ডাক্তারের সহিত গল্প-গুজব করিত। আমার সঙ্গেও তাহার বেশ ভাব হইয়া গিয়াছিল। দুজনের একই বয়স, তার উপর একই ঘরে নিত্য ওঠা-বসা; সুতরাং আমাদের সম্বোধন 'আপনি' হইতে 'তুমি'তে নামিতে বেশী বিলম্ব হয় নাই।

অতুল আসিবার পর হপ্তাখানেক বেশ নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল। তার পর মেসে নানা রকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ করিল।

সন্ধ্যার পর অতুল ও আমি অনুকূল বাবুর ঘরে বসিয়া গল্প করিতে-

ছিলাম। রোগীর ভীড় কমিয়া গিয়াছিল; দু' এক জন মাঝে মাঝে আসিয়া রোগের বিবরণ বলিয়া ঔষধ লইয়া যাইতেছিল, অনুকূল বাবু আমার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে ঔষধ দিতেছিলেন ও হাত-বাক্সে পয়সা তুলিয়া রাখিতেছিলেন। গতরাত্রিতে প্রায় আমাদের বাসার সম্মুখে একটা খুন হইয়া গিয়াছিল, আজ সকালে রাস্তার উপর লাস আবিষ্কৃত হইয়া একটু উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করিতেছিলাম। বিশেষ উত্তেজনার কারণ এই যে, লাস দেখিয়া লোক-টাকে দরিদ্র শ্রেণীর ভাটিয়া বলিয়া মনে হইলেও তাহার কোমরের গেঁজের ভিতর হইতে একশ' টাকার দশকেতা নোট পাওয়া গিয়াছিল। ডাক্তার বলিতেছিলেন,—"এ কোকেন ছাড়া আর কিছু নয়। ভেবে দেখুন, টাকার লোভে যদি খুন করত, তা হ'লে ওর কোমরে হাজার টাকার নোট পাওয়া যেতো না।—আমার মনে হয়, লোকটা কোকেনের খরিদ্দার ছিল; কোকেন কিন্‌তে এসে কোকেন-ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধে কোনও মারাত্মক গুপ্তকথা জানতে পারে। হয় ত তাদের পুলিসের ভয় দেখায়, blackmail করবার চেষ্টা করে। তার পরেই ব্যাস্,—খতম্।"

অতুল বলিল,—"কে জানে মশায়, আমার ত ভারি ভয় করছে। আপনারা এ পাড়ায় আছেন কি ক'রে? আমি যদি আগে জানতুম, তা হ'লে—"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"তা হ'লে উড়ের আড্ডাতেই যেতেন? আমাদের কিন্তু ভয় করে না। আমি ত দশবারো বছর এ পাড়ায় আছি, কিন্তু কারুর কথায় থাকি না ব'লে কখনও হাঙ্গামায় পড়তে হয় নি।"

অতুল ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল,—"ডাক্তার বাবু, আপনি নিশ্চয় কিছু জানেন—না?"

হঠাৎ পিছনে খুট করিয়া একটা শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখি, আমাদের মেসের অশ্বিনী বাবু দরজার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া আমাদের কথা শুনিতে-

ছেন। তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক পাণ্ডুরতা দেখিয়া আমি সবিস্ময়ে বলিলাম,—"কি হয়েছে অশ্বিনী বাবু? আপনি এ সময় নীচে যে?"

অশ্বিনী বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন,—"না, কিছু না—অমনি। এক পয়সার বিড়ি কিনতে—" বলিতে বলিতে তিনি সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমরা পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিলাম। প্রৌঢ় গম্ভীর-প্রকৃতি অশ্বিনী বাবুকে আমরা সকলেই শ্রদ্ধা করিতাম—তিনি হঠাৎ নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিয়া আড়ি পাতিয়া আমাদের কথা শুনিতেছিলেন কেন?

রাত্রিতে আহারে বসিয়া জানিতে পারিলাম অশ্বিনী বাবু পূর্ব্বেই খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়াছেন। আহারান্তে অভ্যাসমত একটা চুরুট শেষ করিয়া শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, অতুল মেঝের উপর কেবল একটা বালিস ফেলিয়া শুইয়া আছে। একটু বিস্মিত হইলাম, কারণ, এমন কিছু গরম পড়ে নাই যে মেঝেয় শোয়া প্রয়োজন হইতে পারে। ঘর অন্ধকার ছিল, অতুলও কোনও সাড়া দিল না—তাই ভাবিলাম, ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আমার তখনও ঘুমের কোনও তাগিদ ছিল না, কিন্তু আলো জ্বালিয়া পড়িতে বা লিখিতে বসিলে হয় ত অতুলের ঘুম ভাঙিয়া যাইবে, তাই খালি পায়ে ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এই ভাবে, বেড়াইবার পর হঠাৎ মনে হইল, যাই অশ্বিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তাঁহার কোনও অসুখ-বিসুখ করিয়াছে কি না। আমার দু'খানা ঘর পরেই অশ্বিনী বাবুর ঘর; গিয়া দেখিলাম, তাঁহার দরজা খোলা, বাহির হইতে ডাক দিয়া সাড়া পাওয়া গেল না। তখন কৌতূহলী হইয়া ঘরে ঢুকিলাম; দ্বারের পাশেই সুইচ ছিল, আলো জ্বালিয়া দেখিলাম ঘরে কেহ নাই। রাস্তার ধারের জানালাটা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলাম, কিন্তু রাস্তাতেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

তাই ত! এত রাত্রে ভদ্রলোক কোথায় গেলেন? অকস্মাৎ মনে হইল,—হয় ত ডাক্তারের নিকট ঔষধ লইতে গিয়াছেন। তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেলাম। ডাক্তারের দরজা ভিতর হইতে বন্ধ। এত রাত্রে নিশ্চয় তিনি শুইয়া পড়িয়াছেন। বন্ধ দরজার সম্মুখে অনিশ্চিতভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় ঘরের ভিতর গলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। অত্যন্ত উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে অশ্বিনী বাবু কথা কহিতেছেন।

একবার লোভ হইল, কান পাতিয়া শুনি কি কথা। কিন্তু পরক্ষণেই সে ইচ্ছা দমন করিলাম,—হয় ত অশ্বিনী বাবু কোনও রোগের কথা বলিতে-ছেন, আমার শোনা উচিত নয়। পা টিপিয়া টিপিয়া উপরে ফিরিয়া আসিলাম।

ঘরে আসিয়া দেখিলাম, অতুল পূর্ব্ববৎ মেঝের উপর শুইয়া আছে, আমাকে দেখিয়া ঘাড় তুলিয়া বলিল,—"কি, অশ্বিনী বাবু ঘরে নেই?"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"না। তুমি জেগে ছিলে?"

"হ্যাঁ। অশ্বিনী বাবু নীচে ডাক্তারের ঘরে আছেন।"

"তুমি জান্‌লে কি ক'রে?"

"কি ক'রে জানলুম, যদি দেখতে চাও, এই বালিসে কান রেখে মাটিতে শোও।"

"কি হে, মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?"

"মাথা ঠিক আছে। শুয়েই দেখ না।"

কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া অতুলের মাথার পাশে মাথা রাখিয়া শুইলাম। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিবার পর অস্পষ্ট কথাবার্ত্তার শব্দ কানে আসিতে লাগিল। তার পর পরিষ্কার শুনিতে পাইলাম, অনুকূল বাবু বলিতেছেন,—"আপনি বড় উত্তেজিত হয়েছেন। ওটা আপনার দৃষ্টি-বিভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। ঘুমের ঘোরে মাঝে মাঝে অমন হয়।

আমি ওষুধ দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে। কাল সকালে উঠে যদি আপনার ঐ বিশ্বাস থাকে, তখন যা হয় করবেন।"

উত্তরে অশ্বিনী বাবু কি বলিলেন, ধরা গেল না। চেয়ার টানার শব্দে বুঝিলাম, দুজনে উঠিয়া পড়িলেন।

আমিও ভূ-শয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম,—"ডাক্তারের ঘরটা যে আমাদের ঘরের নীচেই, তা মনে ছিল না। কিন্তু কি ব্যাপার বল ত? অশ্বিনী বাবুর হয়েছে কি?"

অতুল হাই তুলিয়া বলিল,—"ভগবান্ জানেন। রাত হ'ল, এবার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়া যাক।"

আমি সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি মাটিতে শুয়েছিলে কেন?"

অতুল বলিল,—"সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত-হয়ে পড়েছিলুম, মেঝেটা বেশ ঠাণ্ডা বোধ হ'ল, তাই শুয়ে পড়লুম। ঘুমও একটু এসেছিল, এমন সময় ওঁদের কথাবার্ত্তায় চটকা ভেঙে গেল।"

সিঁড়িতে অশ্বিনী বাবুর পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

ঘড়ীতে দেখিলাম, রাত্রি প্রায় এগারোটা বাজে। অতুল শুইয়া পড়িয়াছিল, মেসও একেবারে নিশুতি হইয়া গিয়াছে। আমি বিছানায় শুইয়া অশ্বিনী বাবুর কথাই ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

সকালে অতুলের ঠেলা খাইয়া ধড় মড় করিয়া উঠিয়া বসিলাম। বেলা সাতটা বাজিয়াছে। অতুল বলিল,—"ওহে, ওঠ ওঠ; গতিক ভাল ঠেকছে না।"

"কেন? কি হয়েছে?"

"অশ্বিনী বাবু ঘরের দরজা খুলছেন না। ডাকাডাকিতে সাড়াও পাওয়া যাচ্ছে না?"

"কি হয়েছে তাঁর ?"

"তা বলা যায় না। তুমি এস—" বলিয়া সে ঘর হইতে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

আমিও তাহার পশ্চাতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, অশ্বিনী বাবুর দরজার সম্মুখে সকলেই উপস্থিত আছেন। উৎকণ্ঠিত জল্পনা ও দ্বার ঠেলাঠেলি চলিতেছে। নীচে হইতে অনুকূল বাবুও আসিয়াছেন। দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল, কারণ, অশ্বিনী বাবু এত বেলা পর্য্যন্ত কখনও ঘুমান্ না। তা ছাড়া, যদি ঘুমাইয়া পড়িয়াই থাকেন, তবে এত হাঁকডাকেও জাগিতেছেন না কেন ?

অতুল অনুকূল বাবুর নিকটে গিয়া বলিল,—"দেখুন, দরজা ভেঙে ফেলা যাক। আমার ত ভাল বোধ হচ্ছে না।"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে আর বল্‌তে! ভদ্রলোক হয় ত মূর্চ্ছিত হয়ে প'ড়ে আছেন, নইলে জবাব দিচ্ছেন না কেন ? আর দেরী নয়, অতুল বাবু, দরজা ভেঙে ফেলুন।"

দেড় ইঞ্চি পুরু কাঠের শক্ত দরজা, তাহার উপর "ইয়েল্ লক্" লাগানো। কিন্তু অতুল এবং আরও দুই তিন জন একসঙ্গে সজোরে ধাক্কা দিতেই বিলাতী তালা ভাঙিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে দরজা খুলিয়া গেল। তখন মুক্ত দ্বারপথে যে-বস্তুটি সকলের দৃষ্টিগোচর হইল তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে ভয়ে কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। স্তম্ভিত হইয়া সকলে দেখিলাম, ঠিক দরজার সম্মুখেই অশ্বিনী বাবু ঊর্দ্ধমুখ হইয়া পড়িয়া আছেন—তাঁহার গলা এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত কাটা। মাথা ও ঘাড়ের নীচে পুরু হইয়া রক্ত জমিয়া যেন একটা লাল মখমলের গালিচা বিছাইয়া দিয়াছে। আর, তাঁহার প্রক্ষিপ্ত প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে একটা রক্ত-মাখানো ক্ষুর তখনও যেন জিঘাংসাভরে হাসিতেছে।

নিশ্চল জড়পিণ্ডবৎ আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। তার পর

অতুল ও ডাক্তার একসঙ্গে ঘরে ঢুকিলেন। ডাক্তার বিহ্বল ভাবে অশ্বিনী বাবুর বিভৎস মৃতদেহের প্রতি তাকাইয়া থাকিয়া কম্পিত স্বরে কহিলেন,—"কি ভয়ানক, শেষে অশ্বিনী বাবু আত্মহত্যা করলেন!"

অতুলের দৃষ্টি কিন্তু মৃতদেহের দিকে ছিল না। তাহার দুই চক্ষু তলোয়ারের ফলার মত ঘরের চারিদিকে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সে একবার বিছানাটা দেখিল, রাস্তার ধারের খোলা জানালা দিয়া উঁকি মারিল, তার পর ফিরিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল,—"আত্মহত্যা নয়, ডাক্তার বাবু, এ খুন, নৃশংস নরহত্যা। আমি পুলিশ ডাকতে চললুম—আপনারা কেউ কোনও জিনিষ ছোঁবেন না।"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"বলেন কি, অতুল বাবু—খুন! কিন্তু দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল,—তা ছাড়া ওটা—" বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া মৃতের হস্তে রক্তাক্ত ক্ষুরটা দেখাইলেন।

অতুল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"তা হোক, তবু এ খুন! আপনারা থাকুন—আমি এখনই পুলিস ডেকে আন্‌ছি!"—সে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ডাক্তার বাবু কপালে হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন,—"উঃ, শেষে আমার বাসাতে এই ব্যাপার হ'ল!"

পুলিসের কাছে মেসের চাকর বামুন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের সকলেরই এজেহার হইল। যে যাহা জানি, বলিলাম। কিন্তু কাহারও জবানবন্দীতে এমন কিছু প্রকাশ পাইল না যাহাতে অশ্বিনী বাবুর মৃত্যুর কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। অশ্বিনী বাবু অত্যন্ত নির্ব্বিরোধ লোক ছিলেন, মেস ও অফিস ব্যতীত অন্য কোথাও তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ ছিল না বলিয়াও জানা গেল না। তিনি প্রতি শনিবারে বাড়ী

যাইতেন। দশ বারো বৎসর এইরূপ চলিয়া আসিতেছে, কখনও ব্যতিক্রম হয় নাই। কিছুদিন হইতে তিনি বহুমূত্র-রোগে ভুগিতে-ছিলেন;—এইরূপ গোটাকয়েক সাধারণ কথাই প্রকাশ পাইল।

ডাক্তার অনুকূল বাবুও এজেহার দিলেন। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাতে অশ্বিনী বাবুর মৃত্যু-রহস্য পরিষ্কার না হইয়া যেন আরও জটিল হইয়া উঠিল। তাঁহার জবানবন্দী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিতেছি;—

"গত বারো বৎসর যাবৎ অশ্বিনী বাবু আমার বাসায় ছিলেন। তাঁর বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায় হরিহরপুর গ্রামে। তিনি সওদাগরী অফিসে কাজ করতেন, একশ কুড়ি টাকা আন্দাজ মাইনে পেতেন। এত অল্প মাহিনায় পরিবার নিয়ে কলকাতায় থাকার সুবিধা হয় না, তাই তিনি একলা মেসে থাকতেন। এ মেসের প্রায় সকলেই তাই ক'রে থাকেন।

"অশ্বিনী বাবুকে আমি যতদূর জানি, তিনি সরল-প্রকৃতির কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক ছিলেন। কখনও কারুর পাওনা ফেলে রাখতেন না, কারুর কাছে এক পয়সা ধার ছিল না। কোন বদ খেয়াল কি নেশা ছিল বলেও আমার জানা নেই; মেসের অন্য সকলেই এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে পারবেন।

"এই বারো বছরের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু লক্ষ্য করি নি। তিনি গত কয়েক মাস থেকে ডায়েবিটিসে ভুগছিলেন, আমারই চিকিৎসাধীনে ছিলেন। কিন্তু তাঁর মানসিক রোগের কোন লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে চোখে পড়ে নি। কাল হঠাৎ তাঁর চাল-চলনে একটা অপ্রকৃতিস্থ ভাব প্রথম লক্ষ্য করলুম।

"কাল বেলা প্রায় পৌনে দশটার সময় আমি আমার ডাক্তারখানায় বসেছিলুম। হঠাৎ অশ্বিনী বাবু এসে বললেন,—'ডাক্তার বাবু, আপনার সঙ্গে আমার একটা গোপনীয় কথা আছে।' একটু আশ্চর্য্য হয়ে তাঁর

মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম ; তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত মনে হ'ল। জিজ্ঞাসা করলুম,—'কি কথা ?' তিনি এদিক্ ওদিক্ চেয়ে চাপা গলায় বল্‌লেন,—'এখন নয়, আর এক সময়। বলেই তাড়াতাড়ি অফিস চ'লে গেলেন।

"সন্ধ্যার পর আমি, অজিত বাবু আর অতুল বাবু আমার ঘরে ব'সে গল্প করছিলুম, হঠাৎ অজিত বাবু দেখতে পেলেন দরজার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্বিনী বাবু আমাদের কথা শুনছেন। তাঁকে ডাকতেই তিনি কোন গতিকে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন। আমরা সবাই অবাক্ হয়ে রইলুম, ভাবলুম, কি হ'ল অশ্বিনী বাবুর ?

"তার পর রাত্রি দশটার সময় তিনি চোরের মত চুপি চুপি আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। মুখ দেখেই বুঝলুম, তাঁর মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ নয়। দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে তিনি আবল্-তাবল্ নানারকম কথা বলতে লাগলেন। কখনও বলেন, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভীষণ বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখেছেন, কখনও বলেন, একটা ভয়ানক গুপ্তরহস্য জানতে পেরেছেন। আমি তাঁকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করলুম কিন্তু তিনি ঝোঁকের মাথায় ব'কেই চললেন। শেষে আমি তাঁকে এক পুরিয়া ঘুমের ওষুধ দিয়ে বলুম,—'আজ রাত্রে শুয়ে পড়ুন গিয়ে, কাল সকালে আপনার কথা শুনব।' তিনি ওষুধ নিয়ে উপরে উঠে গেলেন।

"সেই তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা,—তার পর আজ সকালে এই কাণ্ড! তাঁর ভাবগতিক দেখে তাঁর মানসিক প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ হয়েছিল বটে, কিন্তু তিনি যে এই ক্ষণিক উত্তেজনার বশে আত্মঘাতী হবেন, তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি।"

অনুকূল বাবু নীরব হইলে দারোগা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি মনে করেন, এ আত্মহত্যা ?"

অনুকূল বাবু বলিলেন,—"তা ছাড়া আর কি হ'তে পারে ? তবে

অতুল বাবু বলছিলেন যে, এ আত্মহত্যা নয়—অন্য কিছু। এ বিষয়ে তিনি হয় ত বেশী জানেন, অতএব তিনিই বল্‌তে পারেন।"

দারোগা অতুলের দিকে ফিরিয়া কহিলেন,—"আপনিই না অতুল বাবু? এটা যে আত্মহত্যা নয়, তা মনে করবার কোনও কারণ আছে?"

"আছে। নিজের হাতে মানুষ অমন ভয়ানকভাবে নিজের গলা কাটতে পারে না। আপনি লাস দেখেছেন,—ভেবে দেখুন, এ অসম্ভব।

দারোগা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"হত্যাকারী কে, আপনার কোনও সন্দেহ হয় কি?"

"না।"

"হত্যার কারণ কিছু অনুমান করতে পারেন কি?"

অতুল রাস্তার দিকের জানালাটা নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"ঐ জানালাটা হত্যার কারণ।"

দারোগা সচকিত হইয়া বলিলেন,—"জান্‌লা হত্যার কারণ? আপনি বলতে চান, হত্যাকারী ঐ জান্‌লা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল?"

"না। হত্যাকারী দরজা দিয়েই ঘরে ঢুকেছিল।"

দারোগা মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আপনার বোধহয় স্মরণ নেই যে দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।"

"স্মরণ আছে।"

দারোগা ঈষৎ পরিহাসের স্বরে বলিলেন,—"তবে কি অশ্বিনী বাবু আহত হবার পর দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন?"

"না, হত্যাকারী অশ্বিনী বাবুকে হত্যা করবার পর বাইরে থেকেই দরজা বন্ধ ক'রে দিয়েছিল।"

"সে কি ক'রে হতে পারে?"

অতুল মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—"খুব সহজে, একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

অনুকূল বাবু এতক্ষণ দরজাটার দিকেই তাকাইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন,—ঠিক ত! ঠিক ত! দরজা সহজেই বাইরে থেকে বন্ধ করা যায়, এতক্ষণ আমাদের মাথাতেই ঢোকে নি। দেখছেন না দরজায় যে ইয়েল লক্ লাগানো।"

দারোগা অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন,—"তাও ত বটে—"

অতুল বলিল,—"দরজা বাইরে থেকে টেনে দিলেই বন্ধ হয়ে যায়। তখন আর ভিতর থেকে ছাড়া খোলবার উপায় নেই।"

দারোগা প্রবীণ লোক, তিনি গালে হাত দিয়া ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন,—সে ঠিক। কিন্তু একটা যায়গায় খট্‌কা লাগছে। অশ্বিনী বাবু যে রাত্রে দরজা খুলে শুয়েছিলেন তার কি কোন প্রমাণ আছে?"

অতুল বলিল—"না, বরঞ্চ তার উল্টো প্রমাণ আছে। আমি জানি, তিনি দরজা বন্ধ ক'রে শুয়েছিলেন।"

আমি বলিলাম,—"আমিও জানি। আমি তাঁকে দরজা বন্ধ করতে শুনেছি।"

দারোগা বলিলেন,—"তবে? অশ্বিনী বাবু রাত্রে উঠে হত্যাকারীকে দরজা খুলে দিয়েছিলেন, এ অনুমানও ত সম্ভব ব'লে মনে হয় না।"

অতুল বলিল,—"না। কিন্তু আপনার বোধ হয় স্মরণ নেই যে, অশ্বিনী বাবু গত কয়েক মাস থেকে একটা রোগে ভুগছিলেন।"

"রোগে ভুগছিলেন? ওঃ! ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন অতুল বাবু! ও কথাটা আমার খেয়ালই ছিল না।" দারোগা একটু মুরুব্বীয়ানাভাবে বলিলেন,—"আপনি দেখছি বেশ inteligent লোক, পুলিসে ঢুকে পড়ুন না। এ পথে আপনি উন্নতি করতে পারবেন। কিন্তু এ দিকে ব্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। যদি সত্যিই এটা হত্যাকাণ্ড হয়, তা হ'লে হত্যাকারী যে ভয়ানক হুঁসিয়ার লোক, তাতে

সন্দেহ নেই। কারুর উপর আপনাদের সন্দেহ হয়?" বলিয়া উপস্থিত সকলের মুখের দিকে চাহিলেন।

সকলেই নীরবে মাথা নাড়িলেন। অনুকূল বাবু বলিলেন,—"দেখুন, এ পাড়ায় প্রায় একটা-দুটো খুন হয়, এ খবর অবশ্য আপনার কাছে নূতন নয়। পরশু দিনই আমাদের বাসার প্রায় সাম্‌নে একটা খুন হয়ে গেছে। এই সব দেখে আমার মনে হয় যে, সবগুলো হত্যাই এক সূতোয় গাঁথা,—একটার কিনারা হলেই অন্যটার কিনারা হবে। অবশ্য যদি অশ্বিনী বাবুর মৃত্যুকে হত্যাকাণ্ড ব'লে মেনে নেওয়া হয়।"

দারোগা বলিলেন,—"তা হ'তে পারে। কিন্তু অন্য খুনের কিনারা হবার আশায় ব'সে থাকলে বোধ হয় অনন্তকাল বসেই থাকতে হবে।"

অতুল বলিল,—"দারোগা বাবু, যদি এ খুনের কিনারা করতে চান, তা হ'লে ঐ জানালাটার কথা ভাল ক'রে ভেবে দেখবেন।"

দারোগা ক্লান্তভাবে কহিলেন,—"সব কথাই আমাদের ভাল ক'রে ভেবে দেখতে হবে, অতুল বাবু! এখন আপনাদের প্রত্যেকের ঘর আমি খানাতল্লাস করতে চাই।"

তার পর উপরে নীচে সব ঘরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খানাতল্লাস করা হইল, কিন্তু কোথাও এমন কিছু পাওয়া গেল না যাহার দ্বারা এই মৃত্যু-রহস্যের উপর আলোকপাত হইতে পারে। অশ্বিনী বাবুর ঘরও যথারীতি অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু দু' একটা অতি সাধারণ পারিবারিক চিঠিপত্র ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। ক্ষুরের শূন্য খাপ্‌টা বিছানার পাশেই পড়িয়াছিল। তিনি নিজে ক্ষৌরকার্য্য করিতেন এ কথা আমরা সকলেই জানিতাম, খাপটা চিনিতেও কষ্ট হইল না। অশ্বিনী বাবুর মৃতদেহ পূর্ব্বেই স্থানান্তরিত হইয়াছিল, অতঃপর তাঁহার দরজায় তালা লাগাইয়া শিল-মোহর করিয়া দারোগা বেলা দেড়টা নাগাদ প্রস্থান করিলেন।

অশ্বিনী বাবুর বাড়ীতে 'তার' পাঠানো হইয়াছিল, বৈকালে তাঁহার পুত্ররা ও অন্যান্য নিকট-আত্মীয়বর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের বিস্মিত বিমূঢ় শোকের চিত্রের উপর যবনিকা টানিয়া দিলাম। আমরা অনাত্মীয় হইলেও অশ্বিনী বাবুর এই শোচনীয় মৃত্যুতে প্রত্যেকেই গভীর-ভাবে আহত হইয়াছিলাম। তা ছাড়া নিজেদের প্রাণ লইয়াও কম আশঙ্কা হয় নাই। যেখানে পাশের ঘরে এরূপ ব্যাপার ঘটিতে পারে, সেখানে আমাদের জীবনেরই বা নিশ্চয়তা কি? মলিন সশঙ্ক অবসন্নতার ভিতর দিয়া এই বিপদভারাক্রান্ত দুর্দ্দিনটা কাটিয়া গেল।

রাত্রিকালে শয়নের পূর্ব্বে ডাক্তারের ঘরে গিয়া দেখিলাম, তিনি স্তব্ধ-গম্ভীরমুখে বসিয়া আছেন। এই এক দিনের ঘটনায় তাঁহার শান্ত নিশ্চিহ্ন মুখের উপর কালো কালো রেখা পড়িয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার পাশে বসিয়া বলিলাম,—"বাসার সকলেই ত মেস ছেড়ে চ'লে যাবার জোগাড় করছেন।"

ম্লান হাসিয়া অনুকূল বাবু বলিলেন,—"তাঁদের ত দোষ দেওয়া যায় না, অজিত বাবু। এ রকম ব্যাপার যেখানে ঘটে, সেখানে কে থাকতে চায় বলুন!—কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—একে খুন বলা যেতে পারে কি ক'রে? আর যদি খুনই হয়, তা হ'লে মেসের বাইরের লোকের দ্বারা ত খুন সম্ভব হ'তে পারে না। প্রথমতঃ হত্যাকারী উপরে উঠ্‌ল কি করে? সিঁড়ির দরজা রাত্রিকালে বন্ধ থাকে, এ ত আপনারা সকলে জানেন। যদি ধ'রে নেওয়া যায় যে, লোকটা কোনও কৌশলে উপরে উঠেছিল,—কিন্তু সে অশ্বিনী বাবুর ক্ষুর দিয়ে তাঁকে খুন করলে কি ক'রে? এ কি কখনও সম্ভব? সুতরাং বাইরের লোকের দ্বারা খুন হয় নি এ কথা নিশ্চিত। তা হ'লে বাকি থাকেন কারা?—যাঁরা মেসে থাকেন। এঁদের মধ্যে অশ্বিনী বাবুকে খুন করতে পারে, এমন কেউ আছে কি? সকলকেই আমরা বহুকাল থেকে জানি—কেউ এ কাজ

করতে পারেন না। অবশ্য অতুল বাবু অল্পদিন হ'ল এসেছেন—তাঁর বিষয়ে আমরা কিছু জানি না—"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম,—"অতুল—?"

ডাক্তার বাবু গলা খাটো করিয়া বলিলেন,—"অতুল বাবু, লোকটিকে আপনার কি রকম মনে হয়?"

আমি বলিলাম,—"অতুল? না না, এ কখনও সম্ভব নয়। অতুল কি জন্য অশ্বিনী বাবুকে—"

ডাক্তার বলিলেন,—"তবেই দেখুন, আপনার মুখ থেকেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে, মেসের কেউ এ কাজ করতে পারেন না। তা হ'লে বাকি থাকে কি?—তিনি আত্মহত্যা করেছেন, এই কথাটাই কি বাকি থেকে যাচ্ছে না?"

"কিন্তু আত্মহত্যা করবারও ত একটা কারণ থাকা চাই।"

"সে কথাও আমি ভেবে দেখেছি। আপনার মনে আছে—কিছুদিন আগে আমি বলেছিলুম যে, এ পাড়ায় একটা কোকেনের গুপ্ত সম্প্রদায় আছে।—এই সম্প্রদায়ের সর্দ্দার কে তা কেউ জানে না।"

"হ্যাঁ—মনে আছে।"

ডাক্তার ধীরে ধীরে বলিলেন,—"এখন মনে করুন, অশ্বিনী বাবুই যদি এই সম্প্রদায়ের সর্দ্দার হ'ন?"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বলিলাম,—"সে কি? তাও কি কখনও সম্ভব?"

ডাক্তার বলিলেন,—"অজিত বাবু, পৃথিবীতে কিছুই অসম্ভব নয়। বরঞ্চ কাল রাত্রে অশ্বিনী বাবু আমাকে যে সব কথা বলেছিলেন, তাতে এই সন্দেহই ঘনীভূত হয়—খুব সম্ভব তিনি অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন। অত্যধিক ভয় পেলে মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়তে পারে। কে বলতে পারে, হয় ত এই অপ্রকৃতিস্থতার ঝোঁকেই তিনি আত্মহত্যা করেছেন ভেবে দেখুন, এ অনুমান কি সঙ্গত মনে হয় না?"

এই অভিনব থিয়োরি শুনিয়া আমার মাথা একেবারে গুলাইয়া গিয়াছিল, আমি বলিলাম,—"কি জানি ডাক্তার বাবু, আমি ত কিছুই ধারণা করতে পারছি না। আপনি বরং আপনার সন্দেহের কথা পুলিসকে খুলে বলুন।"

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"কাল তাই বল্‌ব। এ সমস্যার একটা মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত যেন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না।"

দুই তিনটা দিন কোন রকমে কাটিয়া গেল। মনে একান্ত অশান্তির উপর সি-আই-ডি বিভাগের বিবিধ কর্ম্মচারীর নিরন্তর যাতায়াতে ও সওয়াল-জবাবে প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। মেসের প্রত্যেকেই পালাই পালাই করিতেছিলেন, কিন্তু আবার পালাইতেও সাহস হইতেছিল না। কি জানি, তাড়াতাড়ি বাসা ছাড়িলে যদি পুলিস তাঁহাকেই সন্দেহ করিয়া বসে।

বাসারই কোনও ব্যক্তির চারিধারে যে সন্দেহের জাল ধীরে ধীরে গুটাইয়া আসিতেছে, তাহার ইসারা পাইতেছিলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি কে, তাহা অনুমান করিতে পারিতেছিলাম না। মাঝে মাঝে অজ্ঞাত আতঙ্কে বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিতেছিল—পুলিস আমাকেই সন্দেহ করে না ত?

সে দিন সকালে অতুল ও আমি ডাক্তারের ঘরে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলাম। একটা মাঝারি গোছের প্যাকিং কেস্-এ ডাক্তারের ঔষধ আসিয়াছিল, তিনি বাক্স খুলিয়া সেগুলি সযত্নে বাহির করিয়া আলমারীতে সাজাইয়া রাখিতেছিলেন। প্যাকিং কেসের উপর আমেরিকার ছাপ মারা ছিল; ডাক্তার বাবু দেশী ঔষধ ব্যবহার করিতেন না, দরকার হইলেই আমেরিকা কিম্বা জার্ম্মাণী হইতে ঔষধ আনাইয়া

লইতেন। প্রায় মাসে মাসে তাঁহার এক বাক্স করিয়া ঔষধ আসিত।

অতুল খবরের কাগজের অর্দ্ধাংশটা নামাইয়া রাখিয়া বলিল,—"ডাক্তার বাবু, আপনি বিদেশ থেকে ওষুধ আনান্ কেন? দেশী ওষুধ কি ভাল হয় না?"

ডাক্তার বলিলেন,—"দেশী ওষুধও ভাল, কিন্তু আমার তৃপ্তি হয় না।"

অতুল একটা বড় সুগার-অফ-মিল্কের শিশি তুলিয়া লইয়া তাহার গায়ে লেখা বিখ্যাত বিক্রেতাদের নাম দেখিয়া বলিল,—"এরিক্ এণ্ড হ্যাভেল্। এরাই বুঝি সবচেয়ে ভাল ওষুধ তৈরী করে?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা, হোমিওপ্যাথিতে সত্যি সত্যি রোগ সারে? আমার ত বিশ্বাস হয় না। এক ফোঁটা জল খেলে আবার রোগ সারবে কি?"

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"এত লোক যে ওষুধ নিতে আসে, তারা কি ছেলেখেলা করে?"

অতুল বলিল,—"হয় ত রোগ আপনিই সারে, তারা ভাবে ওষুধের গুণে সারল। বিশ্বাসেও অনেক সময় কাজ হয় কি না।"

ডাক্তার শুধু একটু হাসিলেন, কিছু বলিলেন না। কিয়ৎকাল পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খবরের কাগজে আমাদের বাসার কথা কিছু আছে না কি?"

"আছে" বলিয়া আমি পড়িয়া শুনাইলাম,—"হতভাগ্য অশ্বিনীকুমার চৌধুরীর হত্যার এখনও কোন কিনারা হয় নাই। পুলিসের সি-আই-ডি বিভাগ এই হত্যা-রহস্যের তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন। কিছু কিছু তথ্যও আবিষ্কৃত হইয়াছে। আশা করা যাইতেছে, শীঘ্রই আসামী গ্রেপ্তার হইবে।"

"ছাই হবে। ঐ আশা করা পর্য্যন্ত।" ডাক্তার বাবু মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিলেন,—"এ কি! দারোগা বাবু—"

দারোগা ঘরে প্রবেশ করিলেন, সঙ্গে দুই জন কনেষ্টবল। ইনি আমাদের সেই পূর্ব্ব-পরিচিত দারোগা; কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া একেবারে অতুলের সম্মুখে গিয়া বলিলেন,—"আপনার নামে ওয়ারেণ্ট আছে। থানায় যেতে হবে। গোলমাল করবেন না, তাতে কোন ফল হবে না। রামধনী সিং, হ্যাণ্ডকফ লাগাও।" এক জন কনেষ্টবল ক্ষিপ্র অভ্যস্ত হস্তে কড়াৎ করিয়া হাতকড়া পরাইয়া দিল।

আমরা সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। অতুল বলিয়া উঠিল,—"এ কি!"

দারোগা বলিলেন,—"ওই দেখুন ওয়ারেণ্ট। অশ্বিনীকুমার চৌধুরীকে হত্যা করার অপরাধে অতুলচন্দ্র মিত্রকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। আপনারা দু'জনে একে অতুলচন্দ্র মিত্র ব'লে সনাক্ত করছেন?"

নিঃশব্দে অভিভূতের মত আমরা ঘাড় নাড়িলাম।

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল,—"শেষ পর্য্যন্ত আমাকেই ধরলেন। আচ্ছা, চলুন থানায়।—অজিত, কিছু ভেবো না—আমি নির্দ্দোষ।"

একটা ঠিকা গাড়ী ইতিমধ্যে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অতুলকে তাহাতে তুলিয়া পুলিস সদলবলে চলিয়া গেল।

পাংশুমুখে ডাক্তার বলিলেন,—"অতুল বাবুই তা হ'লে—! কি ভয়ানক! কি ভয়ানক! মানুষের মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই।"

আমার মুখে কথা বাহির হইল না। অতুল হত্যাকারী! এই কয় দিন তাহার সহিত একত্র বাস করিয়া তাহার প্রতি আমার মনে একটা প্রীতিপূর্ণ সৌহার্দ্দের সূত্রপাত হইয়াছিল। তাহার স্বভাবটি এত মধুর যে, আমার হৃদয় এই অল্পকালমধ্যেই সে জয় করিয়া লইয়াছিল। সেই অতুল খুনী! কল্পনার অতীত বিস্ময়ে ক্ষোভে মর্ম্মপীড়ায় আমি যেন দিগভ্রান্ত হইয়া গেলাম।

ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"এই জন্যেই অজ্ঞাত-কুলশীল লোককে

আশ্রয় দেওয়া শাস্ত্রে বারণ। কিন্তু তখন কে ভেবেছিল যে লোকটা এতবড় একটা—"

আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না, উঠিয়া গিয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। স্নানাহার করিবারও প্রবৃত্তি হইল না। ঘরের ওপাশে অতুলের জিনিস-পত্র ছড়ানো রহিয়াছে—সেই দিকে চাহিয়া আমার চক্ষে জল আসিয়া পড়িল। অতুলকে যে কতখানি ভাল বাসিয়াছি, তাহা বুঝিতে পারিলাম।

অতুল যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছে,—সে নির্দোষ। তবে কি পুলিস ভুল করিল! আমি বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। যে রাত্রে অশ্বিনী বাবু হত হ'ন, সে রাত্রির সমস্ত কথা স্মরণ করিবার চেষ্টা করিলাম। অতুল মেঝেয় বালিসের উপর কান পাতিয়া ডাক্তারের সহিত অশ্বিনী বাবুর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল! কেন শুনিতেছিল? কি উদ্দেশ্যে? তার পর রাত্রি এগারোটার সময় আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম—একেবারে সকালে ঘুম ভাঙিল। ইতিমধ্যে অতুল যদি—

কিন্তু অতুল গোড়া হইতেই বলিতেছে, এ খুন—আত্মহত্যা নয়। যে স্বয়ং হত্যাকারী, সে কি এমন কথা বলিয়া নিজের গলায় ফাঁসী পরাইবার চেষ্টা করিবে? কিম্বা, এমনও ত হইতে পারে যে নিজের উপর হইতে সন্দেহ ঝাড়িয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যেই অতুল এ কথা বলিতেছে, যাহাতে পুলিস ভাবে যে, অতুল যখন এত জোর দিয়া বলিতেছে এ হত্যা, তখন সে কখনই হত্যাকারী নহে।

এইরূপে নানা চিন্তায়, উদ্‌ভ্রান্ত উৎপীড়িত মন লইয়া আমি বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতে লাগিলাম, কখনও উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে লাগিলাম। এমনই করিয়া দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল।

বেলা তিনটা বাজিল। হঠাৎ মনে হইল, কোনও উকীলের কাছে গিয়া পরামর্শ লইয়া আসি। এরূপ অবস্থায় পড়িলে কি করা উচিত

কিছুই জানা ছিল না, উকীলও কাহাকেও চিনি না। যাহা হউক, একটা উকীল খুঁজিয়া বাহির করা দুষ্কর হইবে না বুঝিয়া একটা জামা গলাইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় দরজায় ধাক্কা পড়িল। দ্বার খুলিয়া দেখি—সম্মুখেই অতুল!

"অ্যাঁ—অতুল!" বলিয়া আমি আনন্দে তাহাকে প্রায় জড়াইয়া ধরিলাম। সে দোষী কি নির্দোষ, এ আন্দোলন মন হইতে একেবারে মুছিয়া গেল।

রুক্ষ মাথা, শুষ্ক মুখ, অতুল হাসিয়া বলিল,—"হ্যাঁ ভাই, আমি। বড্ড ভুগিয়েছে! অনেক কষ্টে এক জন জামীন পাওয়া গেল—তাই ছাড়া পেলুম, নইলে আজ হাজত বাস করতে হ'ত। তুমি চলেছ কোথায়?"

একটু অপ্রতিভভাবে বলিলাম,—"উকীলের বাড়ী।"

অতুল সস্নেহে আমার একটা হাত চাপিয়া দিয়া বলিল,—"আমার জন্যে? তার আর দরকার নেই ভাই। আপাতত কিছু দিনের জন্যে ছাড়ান্ পাওয়া গেছে।"

দু'জনে ঘরের মধ্যে আসিলাম। অতুল ময়লা জামাটা খুলিতে খুলিতে বলিল,—"উঃ, মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করছে! সমস্ত দিন নাওয়া-খাওয়া নেই। তুমিও ত দেখছি নাওনি খাওনি! বেচারি! চল চল, মাথায় দু'ঘটী জল ঢেলে যাহোক দু'টো মুখে দেওয়া যাক। নাড়ী একেবারে চুঁইয়ে গেছে।"

আমি দ্বিধা ঠেলিয়া বলিবার চেষ্টা করিলাম,—"অতুল,—তুমি—তুমি—"

"আমি কি? অশ্বিনী বাবুকে খুন করেছি কি না?" অতুল মৃদুকণ্ঠে হাসিল—"সে আলোচনা পরে হবে। এখন কিছু খাওয়া দরকার। মাথাটা ধরেছে দেখ্‌ছি। যা হোক, স্নান করলেই সেরে যাবে বোধ হয়।"

ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া অতুল বলিল,—"অনুকূল বাবু, ঘষা দোয়ানীর মত আবার আমি ফিরে এলুম। ইংরাজীতে একটা কথা আছে না—bad penny, আমার অবস্থাও প্রায় সেই রকম,—পুলিসেও নিলে না, ফিরিয়ে দিলে।"

ডাক্তার একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"অতুল বাবু, আপনি ফিরে এসেছেন, খুব সুখের বিষয়। আশা করি, পুলিস আপনাকে নির্দ্দোষ বুঝেই ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আমার এখানে আর—আপনার—বুঝতেই ত পারছেন, পাঁচ জনকে নিয়ে মেস্। এম্‌নিতেই সকলে পালাই পালাই করছেন, তার উপর যদি আবার—আপনি কিছু মনে করবেন না, আপনার প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই—কিন্তু—"

অতুল বলিল,—"না না, সে কি কথা! আমি এখন দাগী আসামী, আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনারা বিপদে পড়বেন কেন? বলা ত যায় না, পুলিস হয় ত শেষে আপনাকেও এডিং অ্যাবেটিং চার্জ্জে ফেল্‌বে।—তা, আজই কি চ'লে যেতে বলেন?"

ডাক্তার একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অনিচ্ছাভরে বলিলেন,—"না, আজ রাতটা থাকুন; কিন্তু কাল সকালেই—"

অতুল বলিল,—"নিশ্চয়। কাল আর আপনাদের বিব্রত করব না। যেখানে হোক একটা আস্তানা খুঁজে নেব,—শেষ পর্য্যন্ত উড়িয়া হোটেল ত আছেই।" বলিয়া হাসিল।

ডাক্তার তখন, থানায় কি হইল জিজ্ঞাসা করিলেন। অতুল ভাসা-ভাসা জবাব দিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। ডাক্তার আমাকে বলিলেন,—"অতুল বাবু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেন বুঝতে পারছি—কিন্তু উপায় কি বলুন? একে ত মেসের বদনাম হয়ে গেছে—তার উপর যদি পুলিসের গ্রেপ্তারী আসামী রাখি,—সেটা কি নিরাপদ হবে, আপনিই বলুন!"

বাস্তবিক এটুকু সাবধানতা ও স্বার্থপরতার জন্য কাহাকেও দোষ

দেওয়া যায় না। আমি বিরসভাবে ঘাড় নাড়িলাম, বলিলাম,—"তা—আপনার মেস, আপনি যা ভাল বুঝবেন করবেন।"

আমি গামছা কাঁধে ফেলিয়া স্নান-ঘরের উদ্দেশে প্রস্থান করিলাম; ডাক্তার লজ্জিত বিমর্ষমুখে বসিয়া রহিলেন।

স্নানাহার শেষ করিয়া ঘরে ফিরিতেছি এমন সময় ঘনশ্যাম বাবু অফিস হইতে ফিরিলেন। সম্মুখে অতুলকে দেখিয়া তিনি যেন ভূত দেখার মত চমকিয়া উঠিলেন, পাংশুমুখে বলিলেন,—"অতুল বাবু আপনি—আপনি—?"

অতুল মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আমিই বটে ঘনশ্যাম বাবু। আপনার কি বিশ্বাস হচ্ছে না?"

ঘনশ্যাম বাবু বলিলেন,—"কিন্তু আপনাকে ত পুলিসে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়া একটা ঢোক গিলিয়া তিনি নিজের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন।

অতুলের চক্ষু কৌতুকে নাচিয়া উঠিল, সে মৃদু কণ্ঠে বলিল,—"বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, পুলিস ছুঁলে বোধ হয় আটান্ন। ঘনশ্যাম বাবু আমায় দেখে বিশেষ ভয় পেয়েছেন দেখছি।"

সে দিন সন্ধ্যাবেলা অতুল বলিল,—"ওহে দেখ ত, দরজার তালাটা লাগছে না।"

দেখিলাম, বিলাতী তালায় কি গোলমাল হইয়াছে। গৃহস্বামীকে খবর দিলাম, তিনি আসিয়া দেখিয়া বলিলেন,—"বিলিতি তালার ঐ মুস্কিল; ভাল আছেন ত বেশ আছেন, খারাপ হ'লে একেবারে এঞ্জিনীয়ার ডাকতে হয়। এর চেয়ে আমাদের দিশী হুড়কো ভাল। যা হোক, কালই মেরামত করিয়ে দেব।" বলিয়া তিনি নামিয়া গেলেন।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে অতুল বলিল,—"অজিত, মাথা-ধরাটা ক্রমেই বাড়ছে—কি করি বল ত?"

আমি বলিলাম,—"ডাক্তারের কাছ থেকে এক পুরিয়া ওষুধ নিয়ে খাও না।"

অতুল বলিল,—"হোমিওপ্যাথি ওষুধ? তাতে সারবে?—আচ্ছা চল, দেখা যাক্—হুমো পাখীর জোর।"

আমি বলিলাম,—"চল, আমার শরীরটাও ভাল ঠেকছে না।"

ডাক্তার তখন দ্বার বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, আমাদের দেখিয়া জিজ্ঞাসুভাবে মুখের দিকে চাহিলেন। অতুল বলিল,—আপনার ওষুধের গুণ পরীক্ষা করতে এলুম। বড্ড মাথা ধরেছে—কি ব্যবস্থা করতে পারেন?"

ডাক্তার খুসী হইয়া বলিলেন,—"বিলক্ষণ! পারি বৈ কি! পিত্তি প'ড়ে মাথা ধরেছে—বসুন, এখনি ওষুধ দিচ্ছি।" বলিয়া আলমারী হইতে নূতন ঔষধ পুরিয়া করিয়া আনিয়া দিলেন—"যান খেয়ে শুয়ে পড়ুন গিয়ে—কাল সকালে আর কিছু থাকবে না।—অজিত বাবু, আপনার চেহারাটাও ভাল ঠেকছে না—উত্তেজনার পর অবসাদ বোধ হচ্ছে—না? শরীর টিস্-টিস্ করছে? বুঝেছি, আপনিও এক দাগ নিন—শরীর বেশ ঝরঝরে হয়ে যাবে।"

ঔষধ লইয়া বাহির হইতেছি, অতুল বলিল,—"ডাক্তার বাবু, ব্যোমকেশ বক্সী ব'লে কাউকে চেনেন?"

ডাক্তার ঈষৎ চমকিত হইয়া বলিলেন,—"না। কে তিনি?"

অতুল বলিল,—"জানি না। আজ থানায় তাঁর নাম শুনলুম। তিনি না কি এই হত্যার তদন্ত করছেন।"

ডাক্তার মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না, আমি তাঁকে চিনি না।"

উপরে নিজেদের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আমি বলিলাম,—"অতুল, এবার সব কথা আমায় বল।"

"কি বল্‌ব?"

"তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ। কিন্তু সে হবে না, সব কথা খুলে বলতে হবে।"

অতুল একটু চুপ করিয়া রহিল, তারপর দ্বারের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"আচ্ছা বলছি, এস, আমার বিছানায় ব'স। তোমার কাছে যে আর লুকিয়ে রাখা চলবে না, তা বুঝেছিলুম।"

আমি তাহার বিছানায় গিয়া বসিলাম, সে-ও দরজা ভেজাইয়া দিয়া আমার পাশে বসিল। ঔষধের পুরিয়াটা তখনও আমার হাতেই ছিল, ভাবিলাম, সেটা খাইয়া নিশ্চিন্ত-মনে গল্প শুনিব। মোড়ক খুলিয়া ঔষধ মুখে দিতে যাইতেছি, অতুল আমার হাতটা ধরিয়া বলিল,—"এখন থাক, আমার গল্পটা শুনে নিয়ে তারপর খেয়ো।"

সুইচ তুলিয়া আলো নিবাইয়া দিয়া অতুল আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া তাহার গল্প বলিতে লাগিল, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিয়া চলিলাম। বিস্ময়ে আতঙ্কে মাঝে মাঝে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিতে লাগিল।

পনের মিনিট পরে সংক্ষেপে গল্প সমাপ্ত করিয়া অতুল বলিল,—"আজ এই পর্য্যন্ত থাক, কাল সব কথা খুলে বল্‌ব।" রেডিয়ম অঙ্কিত ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিল,—"এখনও সময় আছে। রাত্রি দু'টোর আগে কিছু ঘটছে না, তুমি বরঞ্চ ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নাও, ঠিক সময়ে আমি তোমাকে তুলে দেব।"

•

রাত্রি তখন বোধ করি দেড়টা হইবে। অন্ধকারে চোখ মেলিয়া বিছানায় শুইয়াছিলাম। শ্রবণেন্দ্রিয় এত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বিছানার উপর দেহের উত্থান-পতনের শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম। অতুল যে জিনিষটা দিয়াছিল, সেটি দৃঢ়মুষ্টিতে ডান হাতে ধরিয়াছিলাম।

হঠাৎ অন্ধকারে কোনো শব্দ শুনিলাম না কিন্তু অতুল আমাকে স্পর্শ করিয়া গেল। ইসারাটা আগে হইতেই স্থির করা ছিল, আমি ঘুমন্ত ব্যক্তির মত জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, সময় উপস্থিত হইয়াছে।

তারপর কখন দরজা খুলিল, জানিতে পারিলাম না; সহসা অতুলের বিছানার উপর ধপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলিয়া উঠিল। লোহার ডাণ্ডা হস্তে আমি তড়াক্ করিয়া বিছানা হইতে লাফাইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, এক হাতে রিভলভার, অন্য হাতে আলোর স্থইচ ধরিয়া অতুল এবং তাহারই শয্যার পাশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া, মরণাহত বাঘ যেমন করিয়া শিকারীর দিকে ফিরিয়া তাকায়, তেমনি বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া—ডাক্তার অনুকূল বাবু!

অতুল বলিল,—"বড়ই দুঃখের বিষয় ডাক্তার বাবু, আপনার মত পাকা লোক শেষকালে পাশবালিশ খুন করলে!—ব্যস্! নড়বেন না! ছুরি ফেলে দিন! হ্যাঁ, নড়েছেন কি গুলী করেছি। অজিত রাস্তার দিকের জানলাটা খুলে দাও ত—বাইরেই পুলিস আছে।—খবরদার—"

ডাক্তার বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দরজা দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অতুলের বজ্রমুষ্টি তাঁহার চোয়ালে হাতুড়ির মত লাগিয়া তাঁহাকে ধরাশায়ী করিল।

মাটীতে উঠিয়া বসিয়া ডাক্তার বলিল,—"বেশ, হার মানলুম। কিন্তু আমার অপরাধ কি শুনি!"

"অপরাধ কি একটা, ডাক্তার, মুখে মুখে বল্‌ব। তার প্রকাণ্ড ফিরিস্তি পুলিস অফিসে তৈরী হয়েছে—ক্রমে প্রকাশ পাবে। আপাতত—

চার-পাঁচ জন কনেষ্টবল সঙ্গে করিয়া দারোগা ও ইন্‌স্পেক্টার প্রবেশ করিল।

অতুল বলিল,—"আপাতত, ব্যোমকেশ বক্সী সত্যান্বেষীকে আপনি খুন করবার চেষ্টা করেছেন, এই অপরাধে পুলিসে সোপর্দ্দ করছি। ইন্‌স-পেক্টর বাবু, ইনিই আসামী।"

ইন্‌সপেক্টর নিঃশব্দে ডাক্তারের হাতে হাতকড়া লাগাইলেন। ডাক্তার বিষাক্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল,—"এ ষড়যন্ত্র! পুলিস আর ঐ ব্যোমকেশ বক্সী মিলে আমাকে মিথ্যে মোকদ্দমায় ফাঁসিয়েছে। কিন্তু আমিও দেখে নেব। দেশে আইন আদালত আছে,—আমারও টাকার অভাব নেই।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা ত নেই-ই। এত কোকেন বিক্রীর টাকা যাবে কোথায়!"

বিকৃত মুখে ডাক্তার বলিল,—"আমি কোকেন বিক্রী করি তার কোনও প্রমাণ আছে?"

"আছে বৈ কি ডাক্তার! তোমার সুগার-অফ-মিল্কের শিশিতেই তার প্রমাণ আছে।"

জোঁকের মুখে নুণ পড়িলে যেমন হয়, ডাক্তার মুহূর্ত্তমধ্যে তেমনই কুঁকড়াইয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া আর কথা বাহির হইল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষু দুটা ব্যোমকেশের উপর শক্তিহীন ক্রোধে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার মনে হইল, এ যেন আমাদের সেই সাদাসিধে নির্ব্বিরোধী অনুকূল বাবু নহে, একটা দুর্দ্দান্ত নরঘাতক গুণ্ডা ভদ্রতার খোলস ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল। ইহারই সহিত এতদিন পরম বন্ধুভাবে কাল কাটাইয়াছি ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিলাম।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি ওষুধ আমাদের দু'জনকে দিয়েছিলে ঠিক ক'রে বল দেখি ডাক্তার? মর্ফিয়ার গুঁড়ো—না? বল্‌বে না? বেশ, বলো না,—কেমিক্যাল পরীক্ষায় ধরা পড়বেই।" একটা চুরুট

৩

ধরাইয়া বিছানায় আরাম করিয়া বসিয়া বলিল,—"দারোগা বাবু, এবার আমার এত্তালা লিখুন।"

ফার্ষ্ট ইনফরমেশন রিপোর্ট লিপিবদ্ধ হইলে পর ডাক্তারের ঘর খানা-তল্লাস করিয়া দু'টি বড় বড় বোতলে কোকেন বাহির হইল। ডাক্তার সেই যে চুপ করিয়াছিল, আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করে নাই। অতঃপর তাহাকে বমাল সমেত থানায় রওনা করিয়া দিতে ভোর হইয়া গেল। তাহাদের চালান করিয়া দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"এখানে ত সব লণ্ড-ভণ্ড হয়ে আছে। চল আমার বাসায়—সেখানে গিয়ে চা খাওয়া যাবে।"

হ্যারিসন রোডের একটা বাড়ীর তে-তলায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, দ্বারের পাশে পিতলের ফলকে লেখা আছে—

শ্রীব্যোমকেশ বক্সী সত্যান্বেষী

ব্যোমকেশ বলিল,—"স্বাগতম্! মহাশয় দীনের কুটীরে পদার্পণ করুন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সত্যান্বেষীটা কি?"

"ওটা আমার পরিচয়। ডিটেকটিব কথাটা শুনতে ভাল নয়, গোয়েন্দা শব্দটা আরও খারাপ। তাই নিজের খেতাব দিয়েছি—সত্যান্বেষী। ঠিক হয় নি?"

সমস্ত তে-তলাটা ব্যোমকেশের—গুটি চার-পাঁচ ঘর আছে; বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"একলাই থাক বুঝি?"

"হ্যাঁ। সঙ্গী কেবল ভৃত্য পুঁটিরাম।"

আমি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম,—"দিব্যি বাসাটি। কত দিন এখানে আছ?"

"প্রায় বছরখানেক,—মাঝে কেবল কয়েক দিনের জন্য তোমাদের বাসায় স্থান পরিবর্ত্তন করেছিলুম।"

ভৃত্য পুঁটিরাম তাড়াতাড়ি ষ্টোভ জ্বালিয়া চা তৈয়ারী করিয়া আনিল। গরম পেয়ালায় চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"আঃ! তোমাদের মেসে ছদ্মবেশে ক'দিন মন্দ কাটল না। ডাক্তার কিন্তু শেষের দিকে ধ'রে ফেলেছিল।—দোষ অবশ্য আমারই!"

"কি রকম?"

"পুলিসের কাছে জানলার কথাটা বলেই ধরা প'ড়ে গেলুম।—বুঝতে পারছ না? ঐ জানলা দিয়েই অশ্বিনী বাবু—"

"না না, গোড়া থেকে বল।"

চায়ে আর এক চুমুক দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"আচ্ছা, তাই বলছি। কতক ত কাল রাত্রেই শুনেছ—বাকিটা শোন। তোমাদের পাড়ায় যে মাসের পর মাস ক্রমাগত খুন হয়েছিল, তা দেখে পুলিসের কর্তৃপক্ষ বেশ বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন। এক দিকে বেঙ্গল গভর্মেণ্ট, অন্য দিকে খপরের কাগজওয়ালারা পুলিসকে ভিতরে-বাইরে খোঁচা দিয়ে আরও অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছিল। এই রকম যখন অবস্থা, তখন আমি গিয়ে পুলিসের বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করলুম, বললুম—'আমি একজন বে-সরকারী ডিটেক্‌টিব, আমার বিশ্বাস আমি এই সব খুনের কিনারা করতে পারব।' অনেক কথাবার্ত্তার পর কমিশনার সাহেব আমাকে অনুমতি দিলেন; সর্ত্ত হ'ল, তিনি আর আমি ছাড়া এ কথা আর কেউ জানবে না।

"তারপর তোমাদের বাসায় গিয়ে জুটলুম। কোনও অনুসন্ধান চালাতে গেলে অকুস্থানের কাছেই base of operations থাকা দরকার, তাই তোমাদের মেসটা বেছে নিয়েছিলুম। তখন কে জানত যে, বিপক্ষ দলেরও base of operations ঐ একই যায়গায়!

"ডাক্তারকে গোড়া থেকেই বড্ড বেশী ভালমানুষ ব'লে মনে হয়েছিল এবং কোকেনের ব্যবসা চালাতে গেলে হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সেজে বসা

যে খুব সুবিধাজনক, সে-কথাও মনের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল! কিন্তু ডাক্তারই যে নাটের গুরু, এ সন্দেহ তখনও হয় নি।

"ডাক্তারকে প্রথম সন্দেহ হ'ল অশ্বিনী বাবু মারা যাবার আগের দিন। মনে আছে বোধ হয়, সে দিন রাস্তার উপর এক জন ভাটিয়ার লাস পাওয়া গিয়েছিল। ডাক্তার যখন শুনলে যে, তার ট্যাঁকের গেঁজে থেকে এক হাজার টাকার নোট বেরিয়েছে, তখন তার মুখে মুহূর্ত্তের জন্য একটা ব্যর্থ লোভের ছবি ফুটে উঠল যে, তা দেখেই আমার সমস্ত সন্দেহ ডাক্তারের ওপর গিয়ে পড়ল।

"তারপর সন্ধ্যাবেলায় অশ্বিনী বাবুর আড়ি পেতে কথা শোনার ঘটনা। আসলে, অশ্বিনী বাবু আমাদের কথা শুনতে আসেন নি, তিনি এসেছিলেন ডাক্তারের সঙ্গে কথা কইতে। কিন্তু আমরা রয়েছি দেখে তাড়াতাড়ি যা হয় একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে চ'লে গেলেন।

"অশ্বিনী বাবুর ব্যবহারে আমার মনে আবার ধোঁকা লাগল, মনে হ'ল, হয় ত তিনিই আসল আসামী। রাত্রিতে মেঝেয় কান পেতে যা শুনলুম, তাতেও ব্যাপারটা স্পষ্ট হ'ল না। শুধু এইটুকু বুঝলাম যে, তিনি ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখেছেন। তারপর সে-রাত্রে যখন তিনি খুন হলেন, তখন আর কোন কথাই বুঝতে বাকি রইল না। ডাক্তার যখন সেই ভাটিয়াটাকে রাস্তার ওপর খুন করে, দৈবক্রমে অশ্বিনী বাবু নিজের জানলা থেকে সে দৃশ্য দেখে ফেলেছিলেন। আর সেই কথাই তিনি গোপনে ডাক্তারকে বলতে গিয়েছিলেন।

"এখন ব্যাপারটা বেশ বুঝ্‌তে পারছ? ডাক্তার কোকেনের ব্যবসা করত, কিন্তু কাউকে জানতে দিত না যে, সে এই কাজের সর্দ্দার! যদি কেউ দৈবাৎ জানতে পেরে যেত, তাকে তৎক্ষণাৎ খুন করত। এই ভাবে সে এতদিন নিজেকে বাঁচিয়ে এসেছে।

"ঐ ভাটিয়াটা সম্ভবতঃ ডাক্তারের দালাল ছিল, হয় ত তারই

মারফতে বাজারে কোকেন সরবরাহ হ'ত। এটা আমার অনুমান, ঠিক না হ'তেও পারে। সে-দিন রাত্রে সে ডাক্তারের কাছে এসেছিল, কোনও কারণে তাদের মধ্যে মনোমালিন্য হয়। হয় ত লোকটা ডাক্তারকে blackmail করবার চেষ্টা করে—পুলিসের ভয় দেখায়। তার পরেই—যেই সে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, অমনই ডাক্তারও পিছন পিছন গিয়ে তাকে শেষ ক'রে দেয়।

"অশ্বিনী বাবু নিজের জানলা থেকে এই দৃশ্য দেখতে পেলেন এবং ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতার বশে সে-কথা ডাক্তারকেই বলতে গেলেন।

"তাঁর কি উদ্দেশ্য ছিল, জানি না। তিনি ডাক্তারের কাছে উপকৃত ছিলেন, তাই হয় ত তাকে সাবধান ক'রে দিতে চেয়েছিলেন। ফল হ'ল কিন্তু ঠিক তার উল্টো। ডাক্তারের চোখে তাঁর আর বেঁচে থাকবার অধিকার রইল না। সেই রাত্রেই কোনও সময় যখন তিনি ঘর থেকে বেরুবার উপক্রম করলেন, অমনই সাক্ষাৎ যম তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল।

"আমাকে ডাক্তার গোড়ায় সন্দেহ করেছিল কি না বলতে পারি না, কিন্তু যখন আমি পুলিসকে বললুম যে, ঐ জানলাটাই অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর কারণ, তখন সে বুঝলে, আমি কিছু-কিছু আন্দাজ করেছি। সুতরাং আমারও ইহলোক ত্যাগ করবার খাঁটি অধিকার জন্মালো। কিন্তু ইহলোক ত্যাগ করবার জন্য আমি একেবারেই ব্যগ্র ছিলুম না। তাই অত্যন্ত সাবধানে দিন কাটাতে লাগলুম।

"তারপর পুলিস এক মস্ত বোকামি ক'রে বস্‌ল, আমাকে গ্রেপ্তার করলে। যা হোক, কমিশনার সাহেব এসে আমাকে খালাস করলেন, আমি আবার মেসে ফিরে এলুম। ডাক্তার তখন স্থির বুঝলে যে, আমি গোয়েন্দা;—কিন্তু সে ভাব গোপন ক'রে আমাকে রাত্রির জন্যে মেসে থাকতে দিয়ে ভারি উদারতা দেখিয়ে দিলে। উদারতার আড়ালে

একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—কোনও রকমে আমাকে খুন করা। কারণ, তার বিষয়ে আমি যত কথা জানতুম, এত আর কেউ জানত না!

"ডাক্তারের বিরুদ্ধে তখন পর্য্যন্ত কিন্তু সত্যিকারের কোনও প্রমাণ ছিল না। অবশ্য তার ঘর খানাতল্লাসী ক'রে কোকেন বার ক'রে তাকে জেলে দেওয়া যেতে পারত, কিন্তু সে যে একটা নিষ্ঠুর খুনী, এ কথা কোনও আদালতে প্রমাণ হ'ত না। তাই আমিও তাকে প্রলোভন দেখাতে সুরু করলুম। দরজার তালায় পেরেক ফেলে দিয়ে আমিই সেটাকে খারাপ ক'রে দিলুম। ডাক্তার খবর পেয়ে মনে মনে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌ল—আমরা রাত্রে দরজা বন্ধ ক'রে শুতে পারব না।

"তারপর আমরা যখন ওষুধ নিতে গেলুম, তখন সে সাক্ষাৎ স্বর্গ হাতে পেলে। আমাদের দু'জনকে দু'পুরিয়া গুঁড়ো মর্ফিয়া দিয়ে ভাবলে, আমরা তাই খেয়ে এমন ঘুমই ঘুমুব যে, সে নিদ্রা মহানিদ্রায় পরিণত হলেও জান্‌তে পারব না।

"তার পরেই ব্যাঘ্র এসে ফাঁদে পা দিলেন। আর কি?"

আমি বলিলাম,—"এখন উঠলুম ভাই। তুমি বোধ হয় উপস্থিত ওদিকে যাচ্ছ না?"

"না। তুমি কি বাসায় যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"বাঃ! কেন আবার! বাসায় যেতে হবে না?

"আমি বলছিলুম কি, ও বাসা ত তোমাকে ছাড়তেই হবে, তা আমার এখানে এলে হ'ত না? এ বাসাটাও নেহাৎ মন্দ নয়।"

আমি খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম,—"প্রতিদান দিচ্ছ বুঝি?"

ব্যোমকেশ আমার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল,—"না ভাই প্রতিদান নয়। মনে হচ্ছে, তোমার সঙ্গে এক যায়গায় না থাকলে আর মন টিঁকবে না। এই ক'দিনেই কেমন একটা বদ্ অভ্যাস জন্মে গেছে।"

"সত্যি বল্‌ছ?"

"সত্যি বল্‌ছি!"

"তবে তুমি থাকো, আমি আমার জিনিষপত্রগুলো নিয়ে আসি।"

ব্যোমকেশ প্রফুল্লমুখে বলিল,—"সেই সঙ্গে আমার জিনিষগুলো আনতে ভুলো না যেন।"

পথের কাঁটা

ব্যোমকেশ খবরের কাগজখানা সযত্নে পাট করিয়া টেবলের এক পাশে রাখিয়া দিল। তার পর চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া অন্যমনস্কভাবে জানালার বাহিরে তাকাইয়া রহিল।

বাহিরে কুয়াসা-বর্জ্জিত ফাল্গুনের আকাশে সকালবেলা আলো ঝল্‌মল্‌ করিতেছিল। বাড়ীর তেতালার ঘর কয়টি লইয়া আমাদের বাসা, বসিবার ঘরটির গবাক্ষপথে সহরের ও আকাশের একাংশ বেশ দেখা যায়। নীচে নবোদ্‌বুদ্ধ নগরীর কর্ম্মকোলাহল আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, হ্যারিসন রোডের উপর গাড়ী-মোটর-ট্রামের ছুটাছুটি ও ব্যস্ততার অন্ত নাই। আকাশের এই চাঞ্চল্য কিয়ৎপরিমাণে প্রতিফলিত হইয়াছে। চড়াই পাখীগুলো অনাবশ্যক কিচিমিচি করিতে করিতে আকাশে উড়িয়া বেড়াইতেছে; তাহাদের অনেক উর্দ্ধে একঝাঁক পায়রা কলিকাতা সহরটাকে নীচে ফেলিয়া যেন সূর্য্যলোক পরিক্রমণ করিবার আশায় উর্দ্ধে উঠিতেছে। বেলা প্রায় আটটা, প্রভাতী চা ও জলখাবার শেষ করিয়া আমরা দুইজন অলসভাবে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা হইতে বহির্জগতের বার্ত্তা গ্রহণ করিতেছিলাম।

ব্যোমকেশ জানলার দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া বলিল,—"কিছু দিন থেকে কাগজে একটা মজার বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে, লক্ষ্য করেছ?"

আমি বললাম,—"না। বিজ্ঞাপন আমি পড়ি না।"

ভ্রূ তুলিয়া একটু বিস্মিত ভাবে ব্যোমকেশ বলিল,—"বিজ্ঞাপন পড় না? তবে পড় কি?"

"খবরের কাগজে সবাই যা পড়ে তাই পড়ি—খবর।"

"অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ায় কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে আর ব্রেজিলে কার একসঙ্গে তিনটে ছেলে হয়েছে, এই পড়। ওসব প'ড়ে

লাভ কি? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তা হ'লে বিজ্ঞাপন পড়।"

ব্যোমকেশ অদ্ভুত লোক, কিন্তু সে পরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশ পাইবে। বাহির হইতে তাহাকে দেখিয়া বা তাহার কথা শুনিয়া একবারও মনে হয় না যে, তাহার মধ্যে অসামান্য কিছু আছে। কিন্তু তাহাকে খোঁচা দিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, একটু উত্তেজিত করিয়া দিতে পারিলে ভিতরকার মানুষটি কচ্ছপের মত বাহির হইয়া আসে। সে স্বভাবতঃ স্বল্পভাষী, কিন্তু ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া একবার তাহাকে চটাইয়া দিতে পারিলে তাহার ছুরির মত শাণিত ঝক্‌ঝকে বুদ্ধি সঙ্কোচ ও সংযমের পর্দ্দা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার কথাবার্ত্তা সত্যই শুনিবার মত বস্তু হইয়া দাঁড়ায়।

আমি খোঁচা দিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না, বলিলাম,—"ও, তাই না কি? কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তা হ'লে ভারি শয়তান, সমস্ত কাগজখানা বিজ্ঞাপনে ভ'রে না দিয়ে কতকগুলো বাজে খবর ছাপিয়ে পাতা নষ্ট করে।"

ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"তাদের দোষ নেই। তোমার মত লোকের চিত্তবিনোদন না করতে পারলে বেচারাদের কাগজ বিক্রী হয় না, তাই বাধ্য হয়ে ঐ সব খবর সৃষ্টি করতে হয়। আসল কাজের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে কে কি ফিকির বার ক'রে দিন-দুপুরে ডাকাতী করছে, কে চোরাই মাল পাচার করবার নূতন ফন্দী আঁটছে,—এই সব দরকারী খবর যদি পেতে চাও ত বিজ্ঞাপন পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু,—থাক—। এবার থেকে না হয় বিজ্ঞাপনই পড়ব। কিন্তু তোমার মজার বিজ্ঞাপনটি কি শুনি?"

ব্যোমকেশ কাগজখানা আমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল,—"পড়ে দেখ, দাগ দিয়ে রেখেছি।"

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে এক কোণে একটি অতি ক্ষুদ্র তিন লাইনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর হইল। লাল পেন্সিল দিয়া দাগ দেওয়া ছিল বলিয়াই চোখে পড়িল, নচেৎ খুঁজিয়া বাহির করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত।

"পথের কাঁটা"

"যদি কেহ পথের কাঁটা দূর করিতে চান, শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটার সময় হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ল্যাম্প-পোষ্টে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন।"

দুই তিনবার পড়িয়াও বিজ্ঞাপনের মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝিতে পারিলাম না, বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ল্যাম্পপোষ্টে হাত রেখে মোড়ের মাথায় দাঁড়ালেই পথের কাঁটা দূর হয়ে যাবে। এ বিজ্ঞাপনের মানে কি? আর পথের কাঁটাই বা কি বস্তু?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সেটা এখনও আবিষ্কার করতে পারি নি। বিজ্ঞাপনটা তিনমাস ধ'রে ফি শুক্রবারে বার হচ্চে, পুরোনো কাগজ ঘাঁটলেই দেখতে পাবে।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু এ বিজ্ঞাপনের সার্থকতা কি? কোনও একটা উদ্দেশ্য নিয়েই ত লোকে বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে? এর ত কোন মানেই হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপাততঃ কোনও উদ্দেশ্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না বটে, কিন্তু তাই বলে উদ্দেশ্য নেই বলা চলে না। অকারণে কেউ গাঁটের কড়ি খরচ করে বিজ্ঞাপন দেয় না।—লেখা পড়লে একটা জিনিষ সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।"

"কি ?"

"যে ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দিয়েছে, তার আত্মগোপন করবার চেষ্টা প্রথমতঃ দেখ, বিজ্ঞাপনে কোনও নাম নেই। অনেক সময় বিজ্ঞাপনে নাম থাকে না বটে, কিন্তু খবরের কাগজের আপিসে খোঁজ নিলে নাম-ধাম সব জানতে পারা যায়। সে রকম বিজ্ঞাপনে বক্স-নম্বর দেওয়া থাকে। এতে তা নেই। তার পর দেখ, যে লোক বিজ্ঞাপন দেয়, সে জনসাধারণের সঙ্গে কোনও একটা কারবার চালাতে চায়,—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। কিন্তু মজা এই যে, এ লোকটি নিজে অদৃশ্য থেকে কারবার চালাতে চায়।"

"বুঝতে পারলুম না।"

"আচ্ছা, বুঝিয়ে বলছি, শোন। যিনি এই বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন, তিনি জনসাধারণকে ডেকে বল্‌ছেন,—'ওহে, তোমরা যদি পথের কাঁটা দূর করতে চাও ত অমুক সময় অমুক স্থানে দাঁড়িয়ে থেকো—এমনভাবে দাঁড়িয়ে থেকো—যাতে আমি তোমাকে চিনতে পারি।'—পথের কাঁটা কি পদার্থ, সে তর্ক এখন দরকার নেই, কিন্তু মনে কর তুমি ঐ জিনিষটা চাও। তোমার কর্ত্তব্য কি ? নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে ল্যাম্পপোষ্ট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা। মনে কর, তুমি যথাসময় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। তারপর কি হ'ল ?"

"কি হ'ল ?"

"শনিবার বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় ঐ জায়গায় কি রকম লোক-সমাগম হয় সেটা বোধ হয় তোমাকে ব'লে দিতে হবে না। এদিকে হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল, ওদিকে নিউ-মার্কেট, চারিদিকে গোটা-পাঁচ-ছয় সিনেমা হাউস্‌। তুমি ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলে আর লোকের ঠেলা খেতে লাগলে, কিন্তু যে আশায় গিয়েছিলে, তা হ'ল না,—কেউ তোমার পথের কাঁটা উদ্ধার করবার মহৌষধ নিয়ে হাজির হ'ল না।

তুমি বিরক্ত হয়ে চ'লে এলে, ভাবলে, ব্যাপারটা আগাগোড়া ভুয়ো। তার পর হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখলে, একখানি চিঠি কে ভিড়ের মধ্যে তোমার পকেটে ফেলে দিয়ে গেছে।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ? চোরে কামারে দেখা হ'ল না অথচ সিঁধকাটি তৈরী হবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বিজ্ঞাপন-দাতার সঙ্গে তোমার লেন-দেনের সম্বন্ধ স্থাপিত হ'ল অথচ তিনি কে, কি রকম চেহারা, তুমি কিছুই জানতে পারলে না।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম,—"যদি তোমার যুক্তি-ধারাকে সত্যি বলেই মেনে নেওয়া যায়, তা হ'লে কি প্রমাণ হয় ?"

"এই প্রমাণ হয় যে 'পথের কাঁটা'র সওদাগরটি নিজেকে অত্যন্ত সঙ্গোপনে রাখতে চান এবং যিনি নিজের পরিচয় দিতে এত সঙ্কুচিত, তিনি বিনয়ী হ'তে পারেন, কিন্তু সাধু-লোক কখনই নন।"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম,—"এ তোমার অনুমান মাত্র, একে প্রমাণ বলতে পার না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরে পায়চারি করিতে করিতে কহিল,—"আরে, অনুমানই ত আসল প্রমাণ। যাকে তোমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব'লে থাকো, তাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো অনুমান বৈ আর কিছুই থাকে না। আইনে যে circumstantial evidence ব'লে একটা প্রমাণ আছে, সেটা কি ? অনুমান ছাড়া আর কিছুই নয়। অথচ তারই জোরে কত লোক যাবজ্জীবন পুলিপোলাও চ'লে যাচ্ছে।"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম, মন হইতে সায় দিতে পারিলাম না। অনুমান যে প্রত্যক্ষ প্রমাণের সমকক্ষ হইতে পারে, এ কথা সহজে মানিয়া লওয়া যায় না। অথচ ব্যোমকেশের যুক্তি খণ্ডন করাও কঠিন কাজ। সুতরাং নীরবে থাকাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলাম। জানিতাম, এই

নীরবতায় সে আরও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবে এবং অচিরাৎ আরো জোরালো যুক্তি আনিয়া হাজির করিবে।

একটা চড়াই পাখী কুটা মুখে করিয়া খোলা জানালার উপর আসিয়া বসিল এবং ঘাড় ফিরাইয়া ফিরাইয়া উজ্জ্বল ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া আমাদের পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। ব্যোমকেশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া পড়িয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, ঐ পাখীটা কি চায় বলতে পার ?"

আমি চমকিত হইয়া বলিলাম,—"কি চায়। ওঃ, বোধ হয় বাসা তৈরী করবার একটা জায়গা খুঁজছে।"

"ঠিক জানো ? কোন সন্দেহ নেই ?"

"কোন সন্দেহ নেই।"

দুই হাত পশ্চাতে রাখিয়া মৃদুহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল,—কি ক'রে বুঝলে ? প্রমাণ কি ?"

"প্রমাণ আর কি ! ওর মুখে কুটো—"

"কুটো থাকলেই প্রমাণ হয় যে, বাসা বাঁধতে চায় ?"

দেখিলাম ব্যোমকেশের প্যাঁচে পড়িয়া গিয়াছি।

কহিলাম, "না,—তবে—"

"অনুমান। পথে এস ! এতক্ষণ তবে দেয়ালা করছিলে কেন ?"

"দেয়ালা করি নি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও, চড়াই পাখী সম্বন্ধে যে অনুমান খাটে, মানুষের বেলাতেও সেই অনুমান খাটবে ?"

"কেন নয় ?

"তুমি যদি কুটো মুখে ক'রে একজনের জানালায় উঠে ব'সে থাক, তা হ'লে কি প্রমাণ হবে যে, তুমি বাসা বাঁধতে চাও ?"

"না। তা হ'লে প্রমাণ হবে যে, আমি একটা বদ্ধ পাগল।"

"সে প্রমাণের দরকার আছে কি ?"

ব্যোমকেশ হাসিতে লাগিল। বলিল,—"চটাতে পারবে না। কিন্তু

কথাটা তোমায় মানতেই হবে,—প্রত্যক্ষ প্রমাণ বরং অবিশ্বাস করা যেতে পারে, কিন্তু যুক্তি-সঙ্গত অনুমান একেবারে অমোঘ। তার ভুল হবার জো নেই।”

আমারও জিদ চড়িয়া গিয়াছিল, বলিলাম,—“কিন্তু ঐ বিজ্ঞাপন সম্বন্ধে তুমি যে সব উদ্ভট অনুমান করলে, তা আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না।”

ব্যোমকেশ বলিল,—“সে তোমার মনের দুর্ব্বলতা, বিশ্বাস করবারও ক্ষমতা চাই। যা হোক, তোমার মত লোকের পক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণই ভাল। কাল শনিবার, বিকেলে কোনো কাজও নেই। কালই তোমার বিশ্বাস করিয়ে দেবো।”

“কি ভাবে?”

আমাদের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনা গেল। ব্যোমকেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিয়া বলিল,—“অপরিচিত ব্যক্তি—প্রৌঢ়—মোটাসোটা, নাদুস-নুদুস বললেও অত্যুক্তি হবে না—হাতে লাঠি আছে—কে ইনি? নিশ্চয়ই আমাদের সাক্ষাৎ চান, কারণ, তে-তলায় আমরা ছাড়া আর কেউ থাকে না।” বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

বাহিরে দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। ব্যোমকেশ ডাকিয়া বলিল,—“ভেতরে আসুন—দরজা খোলা।”

দ্বার ঠেলিয়া একটি মধ্যবয়সী স্থূলকায় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হাতে একটি মোটা মলক্কা বেতের রূপার মুঠযুক্ত লাঠি, গায়ে কালো আলপাকার গলাবন্ধ কোট, পরিধানে কোঁচান থান। গৌরবর্ণ সুশ্রী মুখে দাড়ি গোঁফ কামানো, মাথার সম্মুখভাগ টাক পড়িয়া পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তে-তলার সিঁড়ি ভাঙিয়া হাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রথমটা কথা কহিতে পারিলেন না। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ মৃদুস্বরে আমাকে শুনাইয়া বলিল,—"অনুমান! অনুমান!"

আমি নীরবে তাহার এই শ্লেষ হজম করিলাম। কারণ, এক্ষেত্রে আগন্তুকের চেহারা সম্বন্ধে তাহার অনুমান যে বর্ণে বর্ণে মিলিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভদ্রলোক দম লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—ডিটেক্‌টিব ব্যোমকেশ বাবু কার নাম?"

মাথার উপর পাখাটা খুলিয়া দিয়া একখানা চেয়ার নির্দ্দেশ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"বসুন! আমারই নাম ব্যোমকেশ বক্সী, কিন্তু ঐ ডিটেক্‌টিব কথাটা আমি পছন্দ করি না; আমি একজন সত্যান্বেষী। যা হোক, আপনি বড় বিপন্ন হয়েছেন দেখছি। একটু জিরিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে নিন্, তার পর আপনার গ্রামোফোন পিনের রহস্য শুনবো।"

ভদ্রলোকটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ফ্যালফ্যাল করিয়া ব্যোমকেশের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলেন। আমারও বিস্ময়ের অবধি ছিল না। এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে দেখিবামাত্র তাহাকে গ্রামোফোন পিন-রহস্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা একেবারেই আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল না। ব্যোমকেশের অদ্ভুত ক্ষমতার অনেক দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি, কিন্তু এটা যেন ভোজবাজির মত ঠেকিল।

ভদ্রলোক অতিকষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি—আপনি জানলেন কি করে?"

সহাস্যে ব্যোমকেশ বলিল,—"অনুমান মাত্র। প্রথমতঃ আপনি প্রৌঢ়, দ্বিতীয়তঃ আপনি সঙ্গতিপন্ন, তৃতীয়তঃ আপনি সম্প্রতি ভীষণ বিপদে পড়েছেন এবং শেষ কথা—আমার সাহায্য নিতে চান। সুতরাং"—কথাটা অসম্পূর্ণ রাখিয়া ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিল যে, ইহার পর তাঁহার আগমনের হেতু আবিষ্কার করা শিশুর পক্ষেও সহজসাধ্য।

এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে কিছুদিন হইতে এই কলিকাতা সহরে যে অদ্ভুত রহস্যময় ব্যাপার ঘটিতেছিল এবং যাহাকে 'গ্রামোফোন পিন মিস্ত্রী' নাম দিয়া সহরের দেশী, বিলাতী সংবাদপত্রগুলি বিরাট হুলস্থুল বাধাইয়া দিয়াছিল; তাহার ফলে কলিকাতাবাসী লোকের মনে কৌতূহল, উত্তেজনা ও আতঙ্কের অবধি ছিল না। সংবাদপত্রের রোমাঞ্চকর ও ভীতিপ্রদ বিবরণ পাঠ করিবার পর চায়ের দোকানের জল্পনা উত্তেজনায় একেবারে দড়িছেঁড়া হইয়া উঠিয়াছিল এবং গৃহ হইতে পথে বাহির হইবার পূর্ব্বে প্রত্যেক বাঙালী গৃহস্থেরই গায়ে কাঁটা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ব্যাপারটা এই,—মাস দেড়েক পূর্ব্বে সুকীয়া ষ্ট্রীট নিবাসী জয়হরি সান্যাল নামক জনৈক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাতঃকালে কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া পদব্রজে যাইতেছিলেন। রাস্তা পার হইয়া অন্য ফুটপাতে যাইবার জন্য তিনি যেমনই পথে নামিয়াছেন, অমনই হঠাৎ মুখ থুব্ড়িয়া পড়িয়া গেলেন। সকালবেলা রাস্তায় লোকজনের অভাব ছিল না, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া তুলিয়া আনিবার পর দেখিল তাঁহার দেহে প্রাণ নাই। হঠাৎ কিসে মৃত্যু হইল অনুসন্ধান করিতে গিয়া চোখে পড়িল যে, তাঁহার বুকের উপর একবিন্দু রক্ত লাগিয়া আছে—আর কোথাও আঘাতের কোনও চিহ্ন নাই। পুলিশ অপমৃত্যু সন্দেহ করিয়া লাস হাসপাতালে পাঠাইয়া দিল। সেখানে মরণোত্তর পরীক্ষায় ডাক্তার এক অদ্ভুত রিপোর্ট দিলেন। তিনি লিখিলেন, মৃত্যুর কারণ হৃৎপিণ্ডের মধ্যে একটি গ্রামোফোনের পিন বিঁধিয়া আছে। কেমন করিয়া এই পিন হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিল, তাহার কৈফিয়তে বিশেষজ্ঞ অস্ত্র চিকিৎসক লিখিলেন, বন্দুক অথবা ঐ জাতীয় কোনও যন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত এই পিন মৃতের সম্মুখ দিক্ হইতে বক্ষের চর্ম্ম ও মাংস ভেদ করিয়া মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিয়াছে এবং মৃত্যুও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইয়াছে।

এই ঘটনা লইয়া সংবাদপত্রে বেশ একটু আন্দোলন হইল এবং মৃত-ব্যক্তির একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতও বাহির হইয়া গেল। ইহা হত্যাকাণ্ড কিনা এবং যদি তাই হয়, তবে কিরূপে ইহা উদ্ঘাটিত হইল, তাহা লইয়া অনেক গবেষণা প্রকাশিত হইল। কিন্তু একটা কথা কেহই পরিষ্কার করিয়া বলিতে পারিলেন না,—এই হত্যার উদ্দেশ্য কি এবং যে হত্যা করিয়াছে, তাহার ইহাতে কি স্বার্থ! সরকারের পুলিশ যে ইহার তদন্তভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও কাগজে প্রকাশ পাইল। চায়ের দোকানের কাজীরা ফতোয়া দিলেন যে ও কিছু নয়, লোকটার হার্টফেল করিয়াছিল, কিন্তু উপস্থিত ভাল সংবাদের দুর্ভিক্ষ ঘটায় কাগজওয়ালারা এই নূতন ফন্দি বাহির করিয়া তিলকে তাল করিয়া তুলিয়াছে।

ইহার দিন আষ্টেক পরে সহরের সকল সংবাদপত্রে দেড়-ইঞ্চি টাইপে যে সংবাদ বাহির হইল, তাহাতে কলিকাতার ভদ্র বাঙালী সম্প্রদায় উত্তেজনায় খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলেন। চায়ের বৈঠকের ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদের তৃতীয় নয়ন একবারে বিস্ফারিত হইয়া খুলিয়া গেল। এত প্রকার গুজব, আন্দাজ ও জনশ্রুতি জন্মগ্রহণ করিল যে, বর্ষাকালে ব্যাঙের ছাতাও বোধ করি এত জন্মায় না।

'দৈনিক কালকেতু' লিখিল,—

আবার গ্রামোফোন পিন্

অদ্ভুত রোমাঞ্চকর রহস্য?

কলিকাতার পথঘাট নিরাপদ নয়?

"কালকেতু'র পাঠকগণ জানেন, কয়েকদিন পূর্ব্বে জয়হরি সান্যাল পথ দিয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। পরীক্ষায় তাঁহার হৃৎপিণ্ড হইতে একটি গ্রামোফন পিন্ বাহির হয় এবং

ডাক্তার উহাই মৃত্যুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আমরা তখনি সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, ইহা সাধারণ ব্যাপার নয়, ইহার ভিতরে একটা ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র লুক্কায়িত আছে। আমাদের সেই সন্দেহ সত্যে পরিণত হইয়াছে, গতকল্য অনুরূপ আর একটি লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী কৈলাসচন্দ্র মৌলিক কল্য অপরাহ্নে প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘটিকার সময় মোটরে চড়িয়া গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। রেড রোডের কাছে গিয়া তিনি মোটর থামাইয়া পদব্রজে বেড়াইবার জন্য যেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কিছুদূর গিয়াছেন, অমনি 'উঃ' শব্দ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার সোফার ও রাস্তার অন্যান্য লোক মিলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহাকে আবার গাড়ীতে তুলিল, কিন্তু তিনি আর তখন জীবিত নাই। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলেই হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অল্পকাল-মধ্যেই পুলিস আসিয়া পড়িল। কৈলাসবাবুর গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবী ছিল, পুলিস তাঁহার বুকের কাছে এক বিন্দু রক্তের দাগ দেখিয়া অপঘাত-মৃত্যু সন্দেহ করিয়া তৎক্ষণাৎ লাস্ হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। শব-ব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তারের রিপোর্টে প্রকাশ যে, কৈলাসবাবুর হৃৎপিণ্ডে একটি গ্রামোফোন পিন আটকাইয়া আছে, এই পিন তাঁহার সম্মুখদিক্ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিয়াছে।

"স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, ইহা আকস্মিক দুর্ঘটনা নহে, একদল ক্রূর-কর্ম্মা নরঘাতক কলিকাতা সহরে আবির্ভূত হইয়াছে। ইহারা কে এবং কি উদ্দেশ্যে সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগকে খুন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ইহাদের হত্যা করিবার প্রণালী; কোথা হইতে কোন্ অস্ত্রের সাহায্যে ইহারা হত্যা করিতেছে, তাহা গভীর রহস্যে আবৃত।

"কৈলাসবাবু অতিশয় হৃদয়বান্ ও অমায়িক প্রকৃতির লোক ছিলেন,

তাঁহার সহিত কাহারও শত্রুতা থাকা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র আটচল্লিশ বৎসর হইয়াছিল। কৈলাসবাবু বিপত্নীক ও অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যাই তাঁহার অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। আমরা কৈলাসবাবুর শোকসন্তপ্ত কন্যা ও জামাতাকে আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি।

"পুলিশ সজোরে তদন্ত চালাইয়াছে। প্রকাশ যে, কৈলাসবাবুর সোফার কালী সিংকে সন্দেহের উপর গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।"

অতঃপর দুই হপ্তা ধরিয়া খবরের কাগজে খুব হৈ চৈ চলিল। পুলিস সবেগে অনুসন্ধান চালাইতে লাগিল এবং অনুসন্ধানের বেগে বোধ করি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। কিন্তু অপরাধী ধরা পড়া দূরের কথা, গ্রামোফোন পিনের জমাট রহস্য-অন্ধকারের ভিতরে আলোকের রশ্মিটুকু পর্য্যন্ত দেখা গেল না।

পনর দিনের মাথায় আবার গ্রামোফোন পিন দেখা দিল। এবার তাহার শিকার সুবর্ণ-বণিক সম্প্রদায়ের একজন ধনাঢ্য মহাজন—নাম কৃষ্ণদয়াল লাহা। ধর্ম্মতলা ও ওয়েলিংটন স্ট্রীটের চৌমাথা পার হইতে গিয়া ইনি ভূপতিত হইলেন, আর উঠিলেন না। সংবাদপত্রে যে বিরাট রৈ-রৈ আরম্ভ হইল, তাহা বর্ণনার অতীত। পুলিসের অক্ষমতা সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্য তীব্র ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিল। কলিকাতার অধিবাসীদিগের বুকের উপর ভূতের ভয়ের মত একটা বিভীষিকা চাপিয়া বসিল। বৈঠকখানায়, চায়ের দোকানে, রেস্তোরাঁ ও ড্রয়িংরুমে অন্য সকল প্রকার আলোচনা একবারে বন্ধ হইয়া গেল।

তারপর দ্রুত অনুক্রমে আরও দুইটা অনুরূপ খুন হইয়া গেল। কলিকাতা সহর বিহ্বল পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত অসহায়ভাবে পড়িয়া রহিল, এই অচিন্তনীয় বিপৎপাতে কি করিবে, কেমন করিয়া আত্মরক্ষা করিবে, কিছুই যেন ভাবিয়া পাইল না।

বলা বাহুল্য, ব্যোমকেশ এই ব্যাপারে গভীরভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল। চোর ধরা তাহার পেশা এবং এই কাজে সে বেশ একটু নামও করিয়াছে। 'ডিটেকটিভ' শব্দটার প্রতি তাহার যতই বিরাগ থাক, বস্তুতঃ, সে যে একজন বে-সরকারী ডিটেকটিভ ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা সে মনে মনে ভাল রকমই জানিত। তাই এই অভিনব হত্যাকাণ্ড তাহার সমস্ত মানসিক শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন অকুস্থানগুলি আমরা দুইজনে মিলিয়া দেখিয়াও আসিয়াছিলাম। ইহার ফলে ব্যোমকেশ কোনও নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিল কি না জানিনা; করিয়া থাকিলেও আমাকে কিছু বলে নাই। কিন্তু গ্রামোফোন পিন্ সম্বন্ধে সে যেখানে যেটুকু সংবাদ পাইত, তাহাই সযত্নে নোটবুকে টুকিয়া রাখিত। বোধ হয় তাহার মনে মনে ভরসা ছিল যে, একদিন এই রহস্যের একটা ছিন্নসূত্র তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে।

তাই আজ যখন সত্যসত্যই সূত্রটি তাহার হাতে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেখিলাম, বাহিরে শান্ত সংযত ভাব ধারণ করিলেও ভিতরে ভিতরে সে ভয়ানক উত্তেজিত ও অধীর হইয়া উঠিয়াছে।

ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"আপনার নাম শুনে এসেছিলাম, দেখছি ঠকিনি। গোড়াতেই যে আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, তাতে ভরসা হচ্ছে আপনিই আমাকে উদ্ধার করতে পারবেন। পুলিশের দ্বারা কিছু হবে না, তাদের কাছে আমি যাইনি মশাই। দেখুন না, চোখের সামনে দিনে দুপুরে পাঁচ-পাঁচটা খুন হয়ে গেল, পুলিস কিছু করতে পারলে কি? আমিও ত প্রায় গিয়েছিলাম, আর একটু হলেই!"—তাঁহার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে থামিয়া গেল, কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

ব্যোমকেশ সান্ত্বনা স্বরে বলিল,—"আপনি বিচলিত হবেন না। পুলিসে না গিয়ে যে আমার কাছে এসেছেন, ভালই করেছেন। এ ব্যাপারের কিনারা যদি কেউ করতে পারে ত সে পুলিস নয়। আমাকে

গোড়া থেকে সমস্ত কথা খুলে বলুন, অ-দরকারী ব'লে কোনও কথা বাদ দেবেন না। আমার কাছে অ-দরকারী কিছু নেই।"

ভদ্রলোক কতকটা সামলাইয়া লইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"আমার নাম শ্রীআশুতোষ মিত্র, কাছেই নেবুতলায় আমি থাকি! আঠারো বছর বয়স থেকে সারাজীবন ব্যবসা উপলক্ষে ঘুরে ঘুরেই বেড়িয়েছি—বিয়ে-থা করবার অবকাশ পাই নি। তা ছাড়া, ছেলেপিলে নেণ্ডি-গেণ্ডি আমি ভালবাসি না, তাই কোনওদিন বিয়ে করবার ইচ্ছাও হয় নি। আমি গোছালো লোক, একলা থাকতে ভালবাসি। বয়সও কম হয় নি—আসছে মাঘে একান্ন বছর পুরবে। প্রায় বছর দুই হ'ল কাজকর্ম্ম থেকে অবসর নিয়েছি, সারা জীবনের উপার্জ্জন লাখ দেড়েক টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। তারই সুদে আমার বেশ চ'লে যায়। বাড়ী ভাড়াও দিতে হয় না, বাড়ীখানা নিজের। সামান্য গান-বাজনার সখ আছে, তাই নিয়ে বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"অবশ্য পোষ্য কেউ আছে?"

আশুবাবু মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—"না। আত্মীয় বল্‌তে বড় কেউ নেই, তাই, ও হাঙ্গাম পোহাতে হয় না। শুধু একটা লক্ষ্মীছাড়া বখাটে ভাইপো আছে, সেই মাঝে মাঝে টাকার জন্যে জ্বালাতন করতে আসত। কিন্তু সে ছোঁড়া একেবারে বেহেড মাতাল আর জুয়াড়ী, ওরকম লোক আমি বরদাস্ত করতে পারি না, মশায়, তাই তাকে আর বাড়ী ঢুকতে দিই না!

ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—"ভাইপোটি কোথায় থাকেন?"

আশুবাবু বেশ একটু পরিতৃপ্তির সহিত বলিলেন,—"আপাততঃ শ্রীঘরে। রাস্তায় মাতলামী করার জন্যে এবং পুলিসের সঙ্গে মারামারি করার অপরাধে দু'মাস জেল হয়েছে।"

"তার পর বলে যান।"

"বিনোদ ছোঁড়া,—আমার গুণধর ভাইপো, জেলে যাবার পর ক'দিন বেশ আরামে ছিলাম মশায়, কোনও হাঙ্গাম ছিল না। বন্ধু-বান্ধব আমার কেউ নেই, কিন্তু জেনে শুনে কোনও দিন কারও অনিষ্ট করি নি; সুতরাং আমার যে শত্রু আছে, এ কথাও ভাবতে পারি না। কিন্তু হঠাৎ কাল বিনামেঘে বজ্রাঘাত হ'ল। এমন ব্যাপার যে ঘটতে পারে, এ আমার কল্পনার অতীত। গ্রামোফোন পিন্ রহস্যের কথা কাগজে পড়েছি বটে, কিন্তু ও আমার বিশ্বাস হ'ত না, ভাবতাম সব গাঁজাখুরী। কিন্তু সে ভুল আমার ভেঙে গেছে।

"কাল সন্ধ্যাবেলা আমি অভ্যাসমত বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। রোজই যাই, জোড়াসাঁকোর দিকে একটা গানবাজনার মজলিস আছে, সেখানে সন্ধ্যাটা কাটিয়ে ন'টা সাড়ে ন'টার সময় বাড়ী ফিরে আসি, হেঁটেই যাতায়াত করি, আমার যে বয়স, তাতে নিয়মিত হাঁটলে শরীর ভাল থাকে। কাল রাত্রিতে আমি বাড়ী ফিরছি, আমহার্ষ্ট স্ট্রীট আর হ্যারিসন রোডের চৌমাথার ঘড়িতে তখন ঠিক সওয়া ন'টা। রাস্তায় তখনও গাড়ী-মোটরের খুব ভিড়। আমি কিছুক্ষণ ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম, দুটো ট্রাম পাস করে গেল। একটু ফাঁক দেখে আমি চৌমাথা পার হ'তে গেলাম। রাস্তার মাঝামাঝি যখন পৌঁছেছি, তখন হঠাৎ বুকে একটা বিষম ধাক্কা লাগল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের চামড়ার ওপর কাঁটা ফোঁটার মতন একটা ব্যথা অনুভব করলাম, মনে হ'ল, আমার বুকপকেটের ঘড়ির ওপর কে যেন একটা প্রকাণ্ড ঘুষি মারলে। উল্টে পড়েই যাচ্ছিলাম, কিন্তু কোনও রকমে সামলে নিয়ে গাড়ী-ঘোড়া বাঁচিয়ে সামনের ফুটপাথে উঠে পড়লাম।

"মাথাটা যেন ঘুলিয়ে গিয়েছিল, কেমন ক'রে বুকে ধাক্কা লাগল, কিছুই ধারণা করতে পারলাম না। পকেট থেকে ঘড়িটা বার করতে গিয়ে দেখি, ঘড়ী বার হচ্ছে না, কিসে আটকে যাচ্ছে। সাবধানে পকেটের

কাপড় সরিয়ে যখন ঘড়ী বার করলাম, তখন দেখি, তার কাচখানা গুঁড়া হয়ে গেছে—আর—আর একটা গ্রামোফোনের পিন ঘড়ীটাকে ফুঁড়ে মুখ বার ক'রে আছে।"

আশুবাবু বলিতে বলিতে আবার ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, কপালের ঘাম মুছিয়া কম্পিত হস্তে পকেট হইতে একটি ঘড়ীর বাক্স বাহির করিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন,—"এই দেখুন, সেই ঘড়ী—"

ব্যোমকেশ বাক্স খুলিয়া একটি গ্যন-মেটালের পকেট ঘড়ী বাহির করিল। ঘড়ীর কাচ নাই, ঠিক নয়টা কুড়ি মিনিটে বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং তাহার মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া একটি গ্রামোফোন পিনের অগ্রভাগ হিংস্রভাবে পশ্চাদ্দিকে মুখ বাহির করিয়া আছে। ব্যোমকেশ ঘড়ীটা কিছুক্ষণ গভীর মনঃ-সংযোগে নিরীক্ষণ করিয়া আবার বাক্সে রাখিয়া দিল। বাক্সটা টেবিলের উপরে রাখিয়া আশুবাবুকে বলিল,—"তারপর ?"

আশুবাবু বলিলেন,—"তারপর কি ক'রে যে বাড়ী ফিরে এলাম সে আমিই জানি আর ভগবান জানেন। দুশ্চিন্তায় আতঙ্কে সমস্ত রাত্রি চোখের পাতা বুজতে পারি নি। ভাগ্যে পকেটে ঘড়ীটা ছিল, তাই ত প্রাণ বেঁচে গেল—নইলে আমিও ত এতক্ষণ হাসপাতালে মড়ার টেবলে শুয়ে থাকতাম—" আশুবাবু শিহরিয়া উঠিলেন—"এক রাত্রিতে আমার দশ বছর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে গেছে, মশায়। প্রাণ নিয়ে কোথায় পালাব, কি ক'রে আত্মরক্ষা করব, সমস্ত রাত এই শুধু ভেবেছি। শেষ রাত্রে আপনার নাম মনে পড়ল, শুনেছিলাম আপনার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, তাই ভোর না হতেই ছুটে এসেছি। বন্ধ গাড়ীতে চ'ড়ে এসেছি মশায়, হেঁটে আসতে সাহস হয় নি—কি জানি যদি—"

ব্যোমকেশ উঠিয়া গিয়া আশুবাবুর স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল—"আপনি নিশ্চিন্ত হোন ; আমি আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি, আপনার আর

কোন ভয় নেই। কাল আপনার একটা মস্ত ফাঁড়া গেছে, সত্যি, কিন্তু ভবিষ্যতে যদি আমার কথা শুনে চলেন, তা হ'লে আপনার প্রাণের কোন আশঙ্কা থাকবে না।"

আশুবাবু দুই হাতে ব্যোমকেশের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"ব্যোমকেশ বাবু, আমাকে এ বিপদ থেকে রক্ষা করুন, প্রাণ বাঁচান, আমি আপনাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেব।"

ব্যোমকেশ নিজের চেয়ারে ফিরিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—"এ ত খুব ভাল কথা। সবসুদ্ধ তা হ'লে তিন হাজার হ'ল—গভর্মেণ্টও দু'-হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে না? কিন্তু সে পরের কথা, এখন আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন। কাল যে সময় আপনার বুকে ধাক্কা লাগ্‌ল ঠিক সেই সময় আপনি কোনও শব্দ শুনেছিলেন?"

"কি রকম শব্দ?"

"মনে করুন, মোটরের টায়ার ফাটার মত শব্দ!"

আশুবাবু নিঃসংশয়ে বলিলেন,—"না।"

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"আর কোন রকম শব্দ?"

"আমি ত কিছুই মনে করতে পারছি না।"

"ভেবে দেখুন।"

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"রাস্তায় গাড়ী-ঘোড়া চললে যে শব্দ হয়, সেই শব্দ শুনেছিলাম। আর মনে হচ্ছে যেন—যে সময় ধাক্কাটা লাগে, সেই সময় সাইকেলের ঘন্টির কিড়িং কিড়িং শব্দ শুনেছিলাম।"

"কোন রকম অস্বাভাবিক শব্দ শোনেন নি?"

"না।"

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ অন্য প্রশ্ন আরম্ভ করিল,—"আপনার এমন কোনও শত্রু আছে, যে আপনাকে খুন করতে পারে?"

"না। অন্ততঃ আমি জানি না।"

"আপনি বিবাহ করেন নি, সুতরাং ছেলেপুলে নেই। ভাইপোই বোধ হয় আপনার ওয়ারিস?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আশুবাবু বলিলেন,—"না।"

"উইল করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কার নামে সম্পত্তি উইল করেছেন?"

আশু বাবুর গৌরবর্ণ মুখ ধীরে ধীরে রক্তাভ হইয়া উঠিতেছিল, তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সঙ্কোচ-জড়িত স্বরে বলিলেন,—"আমাকে আর সব কথা জিজ্ঞাসা করুন, শুধু ঐ প্রশ্নটি আমায় করবেন না। ওটা আমার সম্পূর্ণ নিজস্ব কথা—প্রাইভেট,—" বলিতে বলিতে অপ্রতিভভাবে থামিয়া গেলেন।

ব্যোমকেশ তীক্ষ্নদৃষ্টিতে আশুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া শেষে বলিল, —"আচ্ছা থাক। কিন্তু আপনার ভাবী ওয়ারিস—তিনি যে-ই হোন—আপনার উইলের কথা জানেন কি?"

"না। আমি আর আমার উকীল ছাড়া আর কেউ জানে না।"

"আপনার ওয়ারিসের সঙ্গে আপনার দেখা হয়?"

চক্ষু অন্য দিকে ফিরাইয়া আশুবাবু বলিলেন,—"হয়।"

"আপনার ভাইপো কতদিন হ'ল জেলে গেছে।"

আশুবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন,—"তা প্রায় তিন হপ্তা হবে।"

ব্যোমকেশ কিয়ৎকাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া রহিল। অবশেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আজ তা হ'লে আপনি আসুন। আপনার ঠিকানা আর ঐ ঘড়ীটা রেখে যান; যদি কিছু জানবার দরকার হয়, আপনাকে খবর দেব।"

আশুবাবু শঙ্কিতভাবে বলিলেন,—"কিন্তু আমার সম্বন্ধে ত কোন ব্যবস্থা করলেন না। ইতিমধ্যে যদি আবার—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনার সম্বন্ধে ব্যবস্থা এই যে, পারৎপক্ষে বাড়ী থেকে বেরুবেন না।"

আশুবাবু পাণ্ডুর মুখে বলিলেন,—"বাড়ীতে আমি একলা থাকি,—যদি—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"না, বাড়ীতে আপনার কোন আশঙ্কা নেই, সেখানে আপনি নিরাপদ। তবে ইচ্ছে হয়, একজন দারোয়ান রাখতে পারেন।"

আশুবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাড়ী থেকে একেবারে বেরুতে পাব না?"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"একান্তই যদি রাস্তায় বেরুনো দরকার হয়ে পড়ে, ফুটপাথ দিয়ে যাবেন। কিন্তু খবরদার, রাস্তায় নামবেন না। রাস্তায় নামলে আপনার জীবন সম্বন্ধে আমার কোন দায়িত্ব থাকবে না।"

আশুবাবু প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ ললাট ভ্রূকুটি-কুটিল করিয়া বসিয়া রহিল। চিন্তা করিবার নূতন সূত্র সে অনেক পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাই আমি তাহার চিন্তায় বাধা দিলাম না। প্রায় আধ ঘণ্টা নীরব থাকিবার পর সে মুখ তুলিয়া বলিল,—"তুমি ভাবছ, আমি আশুবাবুকে পথে নামতে মানা করলুম কেন এবং বাড়ীতে তিনি নিরাপদ, এ কথাই বা জানলুম কি ক'রে?"

চকিত হইয়া বলিলাম,—"হ্যাঁ।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"গ্রামোফোন-পিন ব্যাপারে একটা জিনিস নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ—সব হত্যাই রাস্তায় হয়েছে। ফুটপাথেও নয়। রাস্তার মাঝখানে। এর কারণ কি হ'তে পারে, ভেবে দেখেছ?"

"না। কি কারণ?"

"এর দু'টো কারণ হ'তে পারে। প্রথম রাস্তায় খুন করলে ধরা পড়বার সম্ভাবনা কম,—যদিও আপাতদৃষ্টিতে সেটা অসম্ভব ব'লে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে অস্ত্র দিয়ে খুন করা হয়, রাস্তায় ছাড়া অন্যত্র তাকে ব্যবহার করা চলে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এমন কি অস্ত্র হ'তে পারে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা যখন জানতে পারব, গ্রামোফোন-পিন রহস্য তখন আর রহস্য থাকবে না।"

আমার মাথায় একটা আইডিয়া আসিয়াছিল, বলিলাম,—"আচ্ছা, এমন কোন বন্দুক বা পিস্তল যদি কেউ তৈরী করে, যা দিয়ে গ্রামোফোন-পিন ছোঁড়া যায়?"

সপ্রশংস নেত্রে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"বুদ্ধি খেলিয়েছ বটে, কিন্তু তাতে দু'একটা বাধা আছে। যে ব্যক্তি বন্দুক কিম্বা পিস্তল দিয়ে খুন করতে চায়, সে বেছে বেছে রাস্তার মাঝখানে খুন করবে কেন? সে ত নির্জ্জন স্থানই খুঁজবে! বন্দুকের কথা ছেড়ে দিই, পিস্তল ছুঁড়লে যে আওয়াজ হয়, রাস্তার গোলমালেও সে আওয়াজ ঢাকা পড়ে না। তা ছাড়া বারুদের গন্ধ আছে। কথায় বলে—শব্দে শব্দ ঢাকে, গন্ধ ঢাকে কিসে?"

আমি বলিলাম,—"মনে কর, যদি এয়ার-গ্যন হয়?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল,—"এয়ার-গ্যান ঘাড়ে ক'রে খুন করতে যাওয়ার পরিকল্পনায় নূতনত্ব আছে বটে, কিন্তু সুবুদ্ধির পরিচয় নেই।—না হে না, অত সহজ নয়। এর মধ্যে ভাববার বিষয় হচ্ছে, অস্ত্র যা-ই হোক ছোঁড়বার সময় তার একটা শব্দ হবেই, সে শব্দ ঢাকা পড়ে কি ক'রে?"

আমি বলিলাম,—"তুমিই ত এখনি বলছিলে,—শব্দে শব্দ ঢাকে—"

ব্যোমকেশ হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, অস্ফুট স্বরে কহিল,—"ঠিক ত—ঠিক ত—"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"কি হ'ল ?"

ব্যোমকেশ নিজের দেহটাকে একটা ঝাঁকানি দিয়া যেন চিন্তার মোহ ভাঙিয়া ফেলিল, বলিল,—"কিছু না। এই গ্রামোফোন-পিন রহস্য নিয়ে যতই ভাবা যায়, ততই এই ধারণা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয় যে, সব হত্যা এক সুতোয় গাঁথা। সবগুলোর মধ্যেই একটা অদ্ভুত মিল আছে, যদিও তা হঠাৎ চোখে পড়ে না।"

"কি রকম ?"

ব্যোমকেশ করাগ্রে গণনা করিতে করিতে বলিল,—"প্রথমতঃ দেখ, যাঁরা খুন হয়েছেন,তাঁরা সবাই যৌবনের সীমা অতিক্রম করেছিলেন। আশু বাবু—যিনি ঘড়ীর কল্যাণে বেঁচে গেছেন—তিনিও প্রৌঢ়। তার পর দ্বিতীয় কথা, তাঁরা সকলেই অর্থবান লোক ছিলেন,—হ'তে পারে কেউ বেশী ধনী, কেউ কম ধনী, কিন্তু গরীব কেউ নয়। তৃতীয় কথা, সকলেই পথের মাঝখানে হাজার লোকের সামনে খুন হয়েছেন এবং শেষ কথা—এইটেই সব চেয়ে প্রণিধানযোগ্য—তাঁরা সবাই অপুত্রক—"

আমি বলিলাম,—"তুমি তা হ'লে অনুমান কর যে—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অনুমান এখনও আমি কিছুই করি নি। এগুলো হচ্ছে আমার অনুমানের ভিত্তি, ইংরাজীতে যাকে বলে premise."

আমি বলিলাম,—"কিন্তু এই ক'টি premise থেকে অপরাধীদের ধরা—"

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"অপরাধীদের নয় অজিত, অপরাধীর। গৌরবে ছাড়া এখানে বহুবচন একেবারে অনাবশ্যক। খবরের কাগজওয়ালারা 'মার্ডারস্ গ্যাং' ব'লে যতই চীৎকার করুক, গ্যাংএর মধ্যে কেবল একটি লোক আছেন। তিনিই এই

নরমেধযজ্ঞের হোতা, ঋত্বিক এবং যজমান। এক কথায়, পরব্রহ্মের মত ইনি, একমেবাদ্বিতীয়ম্।"

আমি সন্দেহ প্রকাশ করিয়া বলিলাম,—"এ কথা তুমি কি ক'রে বলতে পারো? কোন প্রমাণ আছে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রমাণ অনেক আছে, কিন্তু উপস্থিত একটা দিলেই যথেষ্ট হবে। এমন অব্যর্থ লক্ষ্য-বেধ করবার শক্তি পাঁচ জন লোকের কখনও সমান মাত্রায় থাকতে পারে? প্রত্যেকটি পিন অব্যর্থভাবে হৃৎ-পিণ্ডের মধ্যে গিয়ে ঢুকেছে,—একটু উঁচু কিম্বা নীচু হয় নি। আশু বাবুর কথাই ধর, ঘড়ীটি না থাকলে ঐ পিন কোথায় গিয়ে পৌঁছুত বল দেখি?—এমন টিপ কি পাঁচ জনের হয়? এ যেন চক্রছিদ্রপথে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করার মত,—দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর মনে আছে ত? ভেবে দেখ, সে কাজ একা অর্জ্জুনই পেরেছিল, মহাভারতের যুগেও এমন অমোঘ নিশানা একজন বৈ দু'জনের ছিল না।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে উঠিয়া পড়িল।

আমাদের এই বসিবার ঘরের পাশে আর একটা ঘর ছিল—সেটা ব্যোমকেশের নিজস্ব। এ ঘরে সে সকল সময় আমাকেও ঢুকিতে দিত না। বস্তুতঃ এ ঘরখানা ছিল একাধারে তাহার লাইব্রেরী, ল্যাবরেটারী, মিউজিয়াম ও গ্রীনরুম। আশু বাবুর ঘড়ীটা তুলিয়া লইয়া সেই ঘরটায় প্রবেশ করিতে করিতে ব্যোমকেশ বলিল,—"খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্চিন্ত হয়ে এটার তত্ত্ব আহরণ করা যাবে। আপাততঃ স্নানের বেলা হয়ে গেছে।"

বৈকালে প্রায় সাড়ে তিনটার সময় ব্যোমকেশ বাহির হইয়া গিয়াছিল। কি কাজে গিয়াছিল, জানি না। যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; আমি তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, চায়ের

সরঞ্জামও তৈয়ার ছিল, সে আসিতেই ভৃত্য টেবলের উপর চা-জলখাবার দিয়া গেল। আমরা নিঃশব্দে জলযোগ সমাধা করিলাম। এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল, ঐ কার্য্যটা একত্র না করিলে মনঃপূত হইত না।

একটা চুরুট ধরাইয়া, চেয়ারে ঠেসান দিয়া বসিয়া ব্যোমকেশ প্রথম কথা কহিল; বলিল,—"আশুবাবু লোকটিকে কেমন মনে হয়?"

ঈষৎ বিস্মিতভাবে বলিলাম,—"কেন বল দেখি? আমার ত বেশ ভাল লোক বলেই মনে হয়—নিরীহ ভালমানুষ গোছের—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আর নৈতিক চরিত্র?"

আমি বলিলাম,—"মাতাল ভাইপো'র উপর যে রকম চটা, তাতে নৈতিক চরিত্র ত ভাল বলেই মনে হয়। তার ওপর বয়স্থ লোক। বিয়ে করেন নি, যৌবনে যদি কিছু উচ্ছৃঙ্খলতা ক'রে থাকেন ত অন্য কথা; কিন্তু এখন আর ওঁর সে সব করবার বয়স নেই।"

ব্যোমকেশ মুচকি হাসিয়া বলিল,—"বয়স না থাকতে পারে, কিন্তু একটি স্ত্রীলোক আছে। জোড়াসাঁকোর যে গানের মজলিসে আশু বাবু নিত্য গানবাজনা ক'রে থাকেন, সেটি ঐ স্ত্রীলোকের বাড়ী। স্ত্রীলোকের বাড়ী বললে বোধ হয় ঠিক বলা হয় না, কারণ, বাড়ীর ভাড়া আশু বাবুই দিয়ে থাকেন এবং গানের মজলিস বললেও বোধ হয় ভুল বলা হয়, যেহেতু দু'টি প্রাণীর বৈঠককে কোন মতেই মজলিস বলা চলে না।"

"বল কি হে! বুড়োর প্রাণে ত রস আছে দেখছি।"

"শুধু তাই নয়, গত বারো তেরো বছর ধ'রে আশু বাবু এই নাগরিকাটীর ভরণ-পোষণ ক'রে আসছেন, সুতরাং তাঁর একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। আবার অন্য পক্ষেও একনিষ্ঠার অভাব নেই, আশু বাবু ছাড়া অন্য কোনও সঙ্গীতপিপাসুর সেখানে প্রবেশাধিকার নেই; দরজায় কড়া পাহারা।"

উৎসুক হইয়া বলিলাম,—"তাই নাকি? সঙ্গীতপিপাসু [illegible]

ঢোকবার মৎলব করেছিলে বুঝি? নাগরিকাটির দর্শন পেলে? কি রকম দেখতে শুনতে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"একবার চকিতের ন্যায় দেখা পেয়েছিলুম। কিন্তু রূপ-বর্ণনা ক'রে তোমার মত কুমার-ব্রহ্মচারীর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে চাই না। এক কথায়,অপূর্ব্ব রূপসী। বয়স ছাব্বিশ সাতাশ, কিন্তু দেখে মনে হয়, বড় জোর উনিশ কুড়ি। আশুবাবুর রুচির প্রশংসা না ক'রে থাকা যায় না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম,—"তা ত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তুমি হঠাৎ আশু বাবুর গুপ্ত জীবন সম্বন্ধে এত কৌতূহলী হয়ে উঠলে কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অপরিমিত কৌতূহল আমার একটা দুর্ব্বলতা। তা ছাড়া আশু বাবুর উইলের ওয়ারিস সম্বন্ধে মনে একটা খটকা লেগেছিল—"

"ইনিই তা হ'লে আশু বাবুর উত্তরাধিকারিণী?"

"সেই রকমই অনুমান হচ্ছে। সেখানে আর একটি ভদ্রলোকের দেখা পেলুম; ফিটফাট বাবু, বয়স পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ, দ্রুতবেগে এসে দারোয়ানের হাতে একখানা চিঠি গুঁজে দিয়ে দ্রুতবেগে চ'লে গেলেন। কিন্তু ও-কথা যাক্। বিষয়টা মুখরোচক বটে, কিন্তু লাভজনক নয়।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া ঘরময় পায়চারি করিতে লাগিল।

বুঝিলাম, অবান্তর আলোচনায় আকৃষ্ট হইয়া পাছে তাহার মন প্রকৃত অনুসন্ধানের পথ হইতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, পাছে আশু বাবুর জীবনের গোপন ইতিহাস তাঁহার উপস্থিত বিপদ ও বিপন্মুক্তির সমস্যা অপেক্ষা বড় হইয়া উঠে, এই ভয়ে ব্যোমকেশও আলোচনাটা আর বাড়িতে দিল না। এমনি ভাবেই যে মানুষের মন নিজের অজ্ঞাতসারে গৌণবস্তুকে মুখ্যবস্তু অপেক্ষা প্রধান করিয়া তুলিয়া শেষে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, তাহা আমারও অজ্ঞাত ছিল না। আমি তাই জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ঘড়ীটা থেকে কিছু পেলে?"

ব্যোমকেশ আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদুহাস্যে বলিল,—"ঘড়ী থেকে তিনটি তত্ত্ব লাভ করেছি। এক—গ্রামোফোন পিনটি সাধারণ এডিসন্-মার্কা পিন, দুই—তার ওজন দু'রতি, তিন—আশু বাবুর ঘড়ীটা একবারে গেছে, আর মেরামত হবে না।"

আমি বলিলাম,—"তার মানে দরকারী তথ্য কিছুই পাও নি।"

ব্যোমকেশ চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল,—"তা বলতে পারি না। প্রথমতঃ বুঝতে পেরেছি যে, পিন ছোঁড়বার সময় হত্যাকারী আর হত ব্যক্তির মধ্যে ব্যবধান সাত আট গজের বেশী হবে না। একটা গ্রামোফোন পিন এত হাল্কা জিনিষ যে, সাত আট গজের বেশী দূর থেকে ছুঁড়লে অমন অব্যর্থ-লক্ষ্য হ'তে পারে না। অথচ হত্যাকারীর টিপ কি রকম অভ্রান্ত, তা ত দেখেছ। প্রত্যেকবার তীর একবারে মর্ম্মস্থানে গিয়ে ঢুকেছে।"

আমি বিস্মিত অবিশ্বাসের সুরে বলিলাম,—"সাত আট গজ দূর থেকে মেরেছে, তবু কেউ ধরতে পারলে না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"সেইটেই হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান প্রহেলিকা। ভেবে দেখ, খুন করবার পর লোকটা হয় ত দর্শকদের মধ্যেই ছিল, হয় ত নিজের হাতে তুলে মৃতদেহ স্থানান্তরিত করেছে; কিন্তু তবু কেউ বুঝতে পারলে না, কি ক'রে সে এমন ভাবে আত্মগোপন করলে?"

আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলাম,—"আচ্ছা, এমন ত হ'তে পারে, হত্যাকারী পকেটের ভিতর এমন একটা যন্ত্র নিয়ে বেড়ায়—যা থেকে গ্রামোফোন পিন ছোঁড়া যায়। তার পর তার শিকারের সামনে এসে পকেট থেকেই যন্ত্রটা ফায়ার করে। পকেটে হাত দিয়ে অনেকেই রাস্তায় চলে, সুতরাং কারু সন্দেহ হয় না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা যদি হ'ত, তা হ'লে ফুটপাথের ওপরেই ত কাজ সারতে পারত। রাস্তায় নামতে হয় কেন? তা ছাড়া, এমন

কোনও যন্ত্র আমার জানা নেই—যা নিঃশব্দে ছোঁড়া অথচ তার নিক্ষিপ্ত গুলি একটা মানুষের শরীর ফুটো ক'রে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে পৌঁছতে পারে। তাতে কতখানি শক্তির দরকার, ভেবে দেখেছ ?"

আমি নিরুত্তর হইয়া রহিলাম, ব্যোমকেশ হাঁটুর উপর কনুই রাখিয়া ও করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বহুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল; শেষে বলিল,—"বুঝতে পারছি, এর একটা খুব সহজ সমাধান হাতের কাছেই রয়েছে, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। যতবার ধরবার চেষ্টা করছি, পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।"

রাত্রিকালে এ বিষয়ে আর কোনও কথা হইল না। নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যোমকেশ অন্যমনস্ক ও বিমনা হইয়া রহিল। সমস্যার যে উত্তরটা হাতের কাছে থাকিয়াও তাহার যুক্তির ফাঁদে ধরা দিতেছে না, তাহারই পশ্চাতে তাহার মন যে ব্যাধের মত ছুটিয়াছে, তাহা বুঝিয়া আমিও তাহার একাগ্র অনুধাবনে বাধা দিলাম না।

পরদিন সকালে চিন্তাক্রান্ত মুখেই সে শয্যা ছাড়িয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুইয়া এক পেয়ালা চা গলাধঃকরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল। ঘণ্টা তিনেক পরে যখন ফিরিল, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কোথায় গিছলে ?"

ব্যোমকেশ জুতার ফিতা খুলিতে খুলিতে অন্যমনে বলিল,—"উকীলের বাড়ী।" তাহাকে উন্মনা দেখিয়া আমি আর প্রশ্ন করিলাম না।

অপরাহ্ণের দিকে তাহাকে কিছু প্রফুল্ল দেখিলাম। সমস্ত দুপুর সে নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাজ করিতেছিল; একবার টেলিফোনে কাহার সহিত কথা কহিল, শুনিতে পাইলাম। প্রায় সাড়ে চারটার সময় সে দরজা খুলিয়া গলা বাড়াইয়া বলিল,—"ওহে কাল কি ঠিক হয়েছিল, ভুলে গেলে ? 'পথের কাঁটা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখবার সময় যে উপস্থিত।"

সত্যই 'পথের কাঁটা'র কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"এস এস, তোমার একটু সাজসজ্জা ক'রে দিই। এমনি গেলে ত চলবে না।"

আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলাম,—"চলবে না কেন?"

ব্যোমকেশ একটা কাঠের কবাট-যুক্ত আলমারী খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটি টিনের বাক্স বাহির করিল। বাক্স হইতে ক্রেপ, কাঁচি, স্পিরিট-গ্যম্ ইত্যাদি বাছিয়া লইয়া বুরুষ দিয়া আমার মুখে স্পিরিট-গ্যম্ লাগাইতে লাগাইতে বলিল,—"অজিত বন্দ্যো যে ব্যোমকেশ বক্সীর বন্ধু, এ খবর অনেক মহাত্মাই জানেন কি না, তাই একটু সতর্কতা।"

মিনিট পনের পরে আমার অঙ্গসজ্জা শেষ করিয়া যখন ব্যোমকেশ ছাড়িয়া দিল, তখন আয়নার সম্মুখে গিয়া দেখি,—কি সর্ব্বনাশ! এ ত অজিত বন্দ্যো নয়, এ যে সম্পূর্ণ আলাদা লোক। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ও ছুঁচোলো গোঁফ যে অজিত বন্দ্যোর কস্মিনকালেও ছিল না। বয়সও প্রায় দশ বছর বাড়িয়া গিয়াছে। রং বেশ একটু ময়লা। আমি ভীত হইয়া বলিলাম,—"এই বেশে রাস্তায় বেরুতে হবে? যদি পুলিসে ধরে?"

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল,—"মা ভৈঃ! পুলিসের বাবার সাধ্য নেই তোমাকে চিনতে পারে। বিশ্বাস না হয়, নীচের তলায় কোনও চেনা ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কয়ে দেখ। জিজ্ঞাসা কর,—অজিত বাবু কোথায় থাকেন?"

আমি আরও ভয় পাইয়া বলিলাম,—"না না, তার দরকার নেই, আমি এমনই যাচ্ছি।"

বাহির হইবার সময় ব্যোমকেশ বলিল,—"কি করতে হবে, তোমার ত জানাই আছে,—শুধু ফেরবার সময় একটু সাবধানে এসো, পেছু নিতে পারে।"

"সে সম্ভাবনা আছে না কি ?"

"অসম্ভব নয়। আমি বাড়ীতেই রইলুম, যত শীগ্‌গীর পার, ফিরে এসো।"

পথে বাহির হইয়া প্রথমটা ভারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। ক্রমে যখন দেখিলাম, আমার ছদ্মবেশ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে না তখন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলাম, একটু সাহসও হইল। মোড়ের একটা দোকানে আমি নিয়মিত পান খাইতাম, খোট্টা পানওয়ালা আমাকে দেখিলেই সেলাম করিত, সেখানে গিয়া সদর্পে পান চাহিলাম। লোকটা নির্ব্বিকার চিত্তে পান দিয়া পয়সা কুড়াইয়া লইল, আমার পানে ভাল করিয়া দৃক্‌পাতও করিল না।

পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর বিলম্ব করা যুক্তিযুক্ত নয় বুঝিয়া ট্রামে চড়িলাম। এস্‌প্ল্যানেডে নামিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সঙ্কেতস্থানে উপস্থিত হইলাম। মনের অবস্থা যদিও ঠিক অভিসারিকার মত নহে, তবু বেশ একটু কৌতুক ও উত্তেজনা অনুভব করিতে লাগিলাম।

কৌতুক কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। যে পথে জনস্রোত জলস্রোতের মতই ছুটিয়া চলিয়াছে, সেখানে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া থাকা সহজ ব্যাপার নহে। দুই চারিটা কনুইএর গুঁতা নির্ব্বিকারভাবে হজম করিলাম। অকারণে সংএর মত ল্যাম্প-পোষ্ট ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকায় অন্য বিপদও আছে। চৌমাথার উপর একটা সার্জ্জেণ্ট দাঁড়াইয়াছিল, সে সপ্রশ্নভাবে আমার দিকে দুই তিনবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এখনই হয় ত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কেন দাঁড়াইয়া আছ? কি করি ফুটপাতের ধারেই হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র দোকানের একটা প্রকাণ্ড কাচ-ঢাকা জানালায় নানাবিধ বিলাতী পণ্য সাজান ছিল, সেই দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলাম। মনে ভাবিলাম, পাড়াগেঁয়ে ভূত মনে করে ক্ষতি নাই, গাঁটকাটা ভাবিয়া হাতে হাতকড়া না পরায়!

ঘড়ীতে দেখিলাম, পাঁচটা পঞ্চাশ। কোনক্রমে আর দশটা মিনিট কাটাইতে পারিলে বাঁচা যায়। অধীরভাবে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম, মনটা নিজের পাঞ্জাবীর পকেটের মধ্যে পড়িয়া রহিল। দুই একবার পকেটে হাত দিয়াও দেখিলাম, কিন্তু সেখানে নূতন কিছুই হাতে ঠেকিল না।

অবশেষে ছয়টা বাজিতেই একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ল্যাম্পপোষ্ট পরিত্যাগ করিলাম। পকেট দুটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম, চিঠিপত্র কিছুই নাই। নিরাশার সঙ্গে সঙ্গে একটা স-মৎসর আনন্দও হইতে লাগিল, যাক্, ব্যোমকেশের অনুমান যে অভ্রান্ত নহে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া গিয়াছে। এইবার তাহাকে বেশ একটু খোঁচা দিতে হইবে। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে এসপ্লানেডের ট্রাম-ডিপোতে আসিয়া পৌছিলাম।

"ছবি লিবেন, বাবু!"

কানের অত্যন্ত নিকটে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া ফিরিয়া দেখি, লুঙ্গিপরা নীচ শ্রেণীর এক জন মুসলমান একখানা খাম আমার হাতে গুঁজিয়া দিতেছে। বিস্মিতভাবে খুলিতেই একখানা কুৎসিত ছবি বাহির হইয়া পড়িল। এরূপ ছবির ব্যবসা কলিকাতার রাস্তাঘাটে চলে জানিতাম; তাই ঘৃণাভরে সেটা ফেরত দিতে গিয়া দেখি লোকটা নাই। সম্মুখে, পশ্চাতে, চারিদিকে চক্ষু ফিরাইলাম; কিন্তু ভিড়ের মধ্যে সেই লুঙ্গিপরা লোকটাকে কোথাও দেখিতে পাইলাম না।

অবাক্ হইয়া কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় একটি ছোট্ট হাসির শব্দে চমক ভাঙিয়া দেখিলাম, এক জন বৃদ্ধ গোছের ফিরিঙ্গি ভদ্রলোক আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। আমার দিকে না তাকাইয়াই তিনি পরিষ্কার বাঙলায় একান্ত পরিচিত কণ্ঠে বলিলেন,—"চিঠি ত পেয়ে গেছ দেখছি, এবার বাড়ী যাও। একটু ঘুরে যেও। এখান থেকে ট্রামে

বৌবাজারের মোড় পর্য্যন্ত যেও, সেখান থেকে বাসে ক'রে হাওড়ার মোড় পর্য্যন্ত, তার পর ট্যাক্সিতে ক'রে বাড়ী যাবে।"

সারকুলার রোডের ট্রাম আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল, সাহেব তাহাতে উঠিয়া বসিলেন।

আমি সমস্ত সহর মাড়াইয়া যখন বাড়ী ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশ আরাম কেদারার উপর লম্বা হইয়া পড়িয়া সিগার টানিতেছে। আমি তাহার সম্মুখে চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলাম,—"সাহেব কখন এলে?"

ব্যোমকেশ ধূম উদ্গীরণ করিয়া বলিল,—"মিনিট কুড়ি।"

আমি বলিলাম,—"আমার পেছু নিয়েছিলে কেন?"

ব্যোমকেশ উঠিয়া বসিয়া বলিল,—"যে কারণে নিয়েছিলুম, তা সফল হ'ল না, এক মিনিট দেরী হয়ে গেল।—তুমি যখন ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে দাঁড়িয়েছিলে, আমি তখন ঠিক তোমার পাঁচ হাত দূরে লেড্‌ল'র দোকানের ভিতর জান্‌লার সামনে দাঁড়িয়ে সিল্কের মোজা পছন্দ করাছলুম। 'পথের কাঁটা'র ব্যাপারী বোধ হয় কিছু সন্দেহ ক'রে থাকবে, বিশেষতঃ তুমি যে-রকম ছটফট করছিলে আর দু'মিনিট অন্তর পকেটে হাত দিচ্ছিলে, তাতে সন্দেহ হবারই কথা। তাই সে তখন চিঠিখানা দিলে না। তুমি চ'লে যাবার পর আমিও দোকান থেকে বেরিয়েছি, মিনিট দুই-তিন দেরী হয়েছিল—তারি মধ্যে লোকটা কাজ হাসিল ক'রে বেরিয়ে গেল। আমি যখন পৌঁছলুম, তখন তুমি খাম হাতে ক'রে ইয়ের মত দাঁড়িয়ে আছ।—কি ক'রে খাম পেলে?"

কি করিয়া পাইলাম, তাহা বিবৃত করিলে পর ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"লোকটাকে ভাল ক'রে দেখেছিলে? কিছু মনে আছে?"

আমি চিন্তা করিয়া বলিলাম,—"না। শুধু মনে হচ্ছে, তার নাকের পাশে একটা মস্ত আঁচিল ছিল।"

ব্যোমকেশ হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সেটা আসল নয়—

নকল। তোমার গোঁফদাড়ির মত।—যাক, এখন চিঠিখানা দেখি, তুমি ইতিমধ্যে বাথরুমে গিয়ে তোমার দাড়িগোঁফ ধুয়ে এস।"

মুখের রোমবাহুল্য বর্জ্জন করিয়া স্নান সারিয়া যখন ফিরিলাম, তখন ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। দুই হাত পিছনে দিয়া সে দ্রুতপদে ঘরে পায়চারি করিতেছে, তাহার মুখে চোখে এমন একটা প্রদীপ্ত উল্লাসের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, তাহা দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা লাফাইয়া উঠিল। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"চিঠিতে কি দেখলে? কিছু পেয়েছ না কি?"

ব্যোমকেশ উচ্ছ্বসিত আনন্দবেগে আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিল,—"শুধু একটি কথা অজিত, একটি ছোট্ট কথা। কিন্তু এখন তোমাকে কিছু বলব না। হাওড়ার ব্রিজ কখনও খোলা অবস্থায় দেখেছ? আমার মনের অবস্থা হয়েছিল ঠিক সেই রকম, দুই দিক্ থেকে পথ এসেছে, কিন্তু মাঝখানটিতে একটুখানি ফাঁক, একটি পন্টুন খোলা। আজ সেই ফাঁকটুকু জোড়া লেগে গেছে।"

"কি ক'রে জোড়া লাগল? চিঠিতে কি আছে?"

"তুমিই প'ড়ে দেখ!" বলিয়া ব্যোমকেশ খোলা কাগজখানা আমার হাতে দিল।

খামের মধ্যে কুৎসিত ছবিটা ছাড়া আর একখানা কাগজ ছিল, তাহা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু পড়িবার সুযোগ হয় নাই। এখন দেখিলাম, পরিষ্কার অক্ষরে লেখা রহিয়াছে,—

"আপনার পথের কাঁটা কে? তাহার নাম ও ঠিকানা কি? আপনি কি চান, পরিষ্কার করিয়া লিখুন। কোনো কথা লুকাইবেন না। নিজের নাম স্বাক্ষর করিবার দরকার নাই। লিখিত পত্র খামে ভরিয়া আগামী রবিবার ১০ই মার্চ্চ রাত্রি বারোটার সময় খিদিরপুর রেস্‌কোর্সের পাশের রাস্তা দিয়া পশ্চিম দিকে যাইবেন। একটি লোক বাইসিক্ল চড়িয়া

আপনার সম্মুখ দিক্ হইতে আসিবে, তাহার চোখে মোটর গগ্‌ল্‌ দেখিলেই চিনিতে পারিবেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আপনার পত্র হাতে লইয়া পাশের দিকে হাত বাড়াইয়া থাকিবেন। বাইসিক্ল আরোহী আপনার হাত হইতে চিঠি লইয়া যাইবে। অতঃপর যথাসময় আপনি সংবাদ পাইবেন।

পদব্রজে একাকী আসিবেন। সঙ্গী থাকিলে দেখা পাইবেন না।"

দুই তিনবার সাবধানে পড়িলাম। খুব অসাধারণ বটে এবং যৎপরোনাস্তি রোমাণ্টিক—তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে ব্যোমকেশের অসম্বৃত আনন্দের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাইলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ব্যাপার বল দেখি! আমি ত এমন কিছু দেখছি না—"

"কিছু দেখতে পেলে না?"

"অবশ্য তুমি কাল যা অনুমান করেছিলে, তা বর্ণে বর্ণে মিলে গেছে, তাতে সন্দেহ নেই। লোকটার আত্মগোপন করবার চেষ্টার মধ্যে হয় ত কোন বদ মৎলব থাকতে পারে। কিন্তু তা ছাড়া আর ত আমি কিছু দেখছি না।"

"হায় অন্ধ! অতবড় জিনিষটা দেখতে পেলে না?—ব্যোমকেশ হঠাৎ থামিয়া গেল, বাহিরে সিঁড়িতে পদশব্দ হইল। ব্যোমকেশ ক্ষণকাল একাগ্রমনে শুনিয়া বলিল,—"আশু বাবু। এ সব কথা ওঁকে বলবার দরকার নেই—" বলিয়া চিঠিখানা আমার হাত হইতে লইয়া পকেটে পুরিল।

আশু বাবু ঘরে প্রবেশ করিলে তাঁহার চেহারা দেখিয়া একবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। একদিনের মধ্যে মানুষের চেহারা এতখানি পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, তাহা কল্পনা করাও কঠিন। মাথার চুল অবিন্যস্ত, জামা কাপড়ের পারিপাট্য নাই, গালের মাংস ঝুলিয়া গিয়াছে,

চোখের কোলে কালি, যেন অকস্মাৎ কোনও মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়া একবারে ভাঙিয়া পড়িয়াছেন। কাল সন্ত-মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইবার পরও তাঁহাকে এত অবসন্ন ম্রিয়মাণ দেখি নাই। তিনি একখানা চেয়ারে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—"একটা দুঃসংবাদ পেয়ে আপনাকে খবর দিতে এসেছি ব্যোমকেশ বাবু। আমার উকীল বিলাস মল্লিক পালিয়েছে।"

ব্যোমকেশ গম্ভীর অথচ সদয় কণ্ঠে কহিল,—"সে পালাবে আমি জানতুম। সেই সঙ্গে আপনার জোড়াসাঁকোর বন্ধুটিও গেছেন, বোধ হয় খবর পেয়েছেন।"

আশু বাবু হতবুদ্ধির মত কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলেন,—"আপনি—আপনি সব জানেন?"

ব্যোমকেশ শান্ত স্বরে কহিল,—"সমস্ত। কাল আমি জোড়াসাঁকোয় গিয়েছিলুম, বিলাস মল্লিককেও দেখেছি। বিলাস মল্লিকের সঙ্গে ঐ স্ত্রীলোকটির অনেক দিন থেকে ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র চলছিল—আপনি কিছুই জানতেন না। আপনার উইল তৈরী করবার পরই বিলাস উকীল আপনার উত্তরাধিকারিণীকে দেখতে যায়। প্রথমটা বোধ হয় কৌতূহলবশে গিয়েছিল, তার পর ক্রমে—যা হয়ে থাকে। ওরা এত দিন সুযোগ অভাবেই কিছু করতে পারছিল না। আশু বাবু, আপনি দুঃখিত হবেন না, এ আপনার ভালই হ'ল—অসৎ স্ত্রীলোক এবং কপট বন্ধুর ষড়যন্ত্র থেকে আপনি মুক্তি পেলেন। আর আপনার জীবনের কোনও ভয় নেই—এখন আপনি নির্ভয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন।"

আশু বাবু শঙ্কাব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"তার মানে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তার মানে, আপনি যা মনে মনে সন্দেহ করেছেন অথচ বিশ্বাস করতে পারছেন না, তাই ঠিক। ওরাই দুজনে আপনাকে হত্যা করবার মতলব করেছিল; তবে নিজের হাতে নয়।

এই কলকাতা সহরেই এক জন লোক আছে—যাকে কেউ চেনে না, কেউ চোখে দেখেনি—অথচ যার নিষ্ঠুর অস্ত্র পাঁচ জন নিরীহ নিরপরাধ লোককে পৃথিবী থেকে নিঃশব্দে সরিয়ে দিলে। আপনাকেও সরাতো, শুধু পরমায়ু ছিল বলেই আপনি বেঁচে গেলেন।"

আশু বাবু বহুক্ষণ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন, শেষে মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—"বুড়ো বয়সে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছি, কাউকে দোষ দেবার নেই!—আটত্রিশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমি নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করেছিলাম, তার পর হঠাৎ পদস্খলন হয়ে গেল। এক দিন দেওঘরে তপোবন দেখতে গিয়েছিলাম, সেখানে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী মেয়ে দেখে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বিবাহে আমার চিরদিন অরুচি, কিন্তু তাকে বিবাহ করবার জন্যে একেবারে পাগল হয়ে উঠলাম। শেষে এক দিন জানতে পারলাম, সে বেশ্যার মেয়ে। বিবাহ হ'ল না, কিন্তু তাকে ছাড়তেও পারলাম না। কলকাতায় এনে বাড়ী ভাড়া ক'রে রাখলাম। সেই থেকে এই বারো তেরো বছর তাকে স্ত্রীর মতই দেখে এসেছি। তাকে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়েছিলুম, সে ত আপনি জানেন। ভাবতাম, সেও আমাকে স্বামীর মত ভালবাসে—কোনও দিন সন্দেহ হয়নি। বুঝতে পারিনি যে, পাপের রক্তে যার জন্ম, সে কখনও সাধ্বী হ'তে পারে না!—যাক, বুড়ো বয়সে যে শিক্ষা পেলাম, হয় ত পরজন্মে কাজে লাগবে।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ভগ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওরা—তারা কোথায় গিয়েছে, আপনি জানেন কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"না। আর সে জেনেও কোন লাভ নেই। নিয়তি তাদের যে পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, সে পথে আপনি যেতে পারবেন না। আশু বাবু, আপনার অপরাধ সমাজের কাছে হয় ত নিন্দিত হবে, কিন্তু আমি আপনাকে চিরদিন শ্রদ্ধা করব জানবেন।

মনের দিক থেকে আপনি খাঁটি আছেন, কাদা ঘেঁটেও আপনি নির্ম্মল থাকতে পেরেছেন, এইটেই আপনার সব চেয়ে বড় প্রশংসার কথা। এখন আপনার খুবই আঘাত লেগেছে, এ রকম বিশ্বাসঘাতকতায় কার না লাগে? কিন্তু ক্রমে বুঝবেন, এর চেয়ে ইষ্ট আপনার আর কিছু হ'তে পারত না।"

আশু বাবু আবেগপূর্ণ স্বরে কহিলেন,—"ব্যোমকেশ বাবু, আপনি আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট, কিন্তু আপনার কাছে আমি আজ যে সান্ত্বনা পেলাম, এ আমি কোথাও প্রত্যাশা করিনি। নিজের লজ্জাকর পাপের ফল যে ভোগ করে, তাকে কেউ সহানুভূতি দেখায় না, তাই তার প্রায়শ্চিত্ত এত ভয়ঙ্কর। আপনার সহানুভূতি পেয়ে আমার অর্দ্ধেক বোঝা হাল্কা হয়ে গেছে। আর বেশী কি বল্‌ব, চিরদিনের জন্য আপনার কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।"

আশু বাবু বিদায় লইবার পর তাহার অদ্ভুত ট্র্যাজেডির ছায়ায় মনটা আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। শয়নের পূর্ব্বে ব্যোমকেশকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আশু বাবুকে খুন করার চেষ্টার পিছনে যে বিলাস উকীল আর ঐ স্ত্রীলোকটা আছে, এ কথা তুমি কবে জান্‌লে?"

ব্যোমকেশ কড়িকাঠ হইতে চক্ষু নামাইয়া বলিল,—"কাল বিকেলে।"

"তবে পালাবার আগে তাদের ধরলে না কেন?"

"ধরলে কোন লাভ হ'ত না, তাদের অপরাধ কোনও আদালতে প্রমাণ হ'ত না।"

"কিন্তু তাদের কাছ থেকে আসল হত্যাকারী গ্রামোফোন পিনের আসামীর সন্ধান পাওয়া যেতে পারত।"

ব্যোমকেশ মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল,—"তা যদি সম্ভব হ'ত, তা হ'লে আমি নিজে তাদের তাড়াবার চেষ্টা করতুম না।"

"তুমি তাদের তাড়িয়েছ?"

"হ্যাঁ। আশু বাবু দৈবক্রমে বেঁচে যাওয়াতে তারা উড়ু উড়ু করছিলই, আমি আজ সকালে বিলাস উকীলের বাড়ী গিয়ে ইসারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলুম যে আমি অনেক কথাই জানি, যদি এই বেলা স'রে না পড়েন ত হাতে দড়ি পড়বে। বিলাস উকীল বুদ্ধিমান লোক, সন্ধ্যার গাড়ীতেই বমাল সমেত নিরুদ্দেশ হলেন।"

"কিন্তু ওদের তাড়িয়ে তোমার লাভ কি হ'ল ?"

ব্যোমকেশ একটা হাই তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"লাভ এমন কিছু নয়, কেবল একটু দুষ্টের দমন করা গেল। বিলাস উকীল শুধু-হাতে নিরুদ্দেশ হবার লোক নন, মক্কেলের টাকাকড়ি যা তাঁর কাছে ছিল, সমস্তই সঙ্গে নিয়েছিলেন এবং এতক্ষণে বোধ করি, বর্দ্ধমানের পুলিস তাঁকে হাজতে পুরেছে—আগে থাকতেই তারা খবর জানত কি না! যা হোক, বিলাসচন্দ্রের দু'বচ্ছর সাজা কেউ ঠেকাতে পারবে না। যদিও ফাঁসীই তার উচিত শাস্তি, তবু, তা যখন উপস্থিত দেওয়া যাচ্ছে না, তখন দু'বচ্ছরই বা মন্দ কি ?"

পরদিন প্রাতঃকালে একজন অপরিচিত আগন্তুক দেখা করিতে আসিল।

সবেমাত্র চায়ের বাটি নামাইয়া রাখিয়া খবরের কাগজখানা খুলিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় দরজায় কড়া নড়িয়া উঠিল।

ব্যোমকেশ সচকিত হইয়া বলিল,—"কে ? আসুন।"

একটি ভদ্রবেশধারী সুশ্রী যুবক প্রবেশ করিল। দাড়িগোঁফ কামানো, একহারা ছিপছিপে গড়ন, বয়স ত্রিশের মধ্যেই—চেহারা দেখিলে মনে হয়, একজন অ্যাথ্‌লেট। সম্মুখে আমাদের দেখিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া বলিল,—"কিছু মনে করবেন না, সকালবেলাই বিরক্ত করতে এলাম।

আমার নাম প্রফুল্ল রায়—আমি একজন বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট।” বলিয়া অনাহূতভাবেই একখানা চেয়ার অধিকার করিয়া বসিল।

ব্যোমকেশ বিরস স্বরে বলিল,—“আমাদের জীবন বীমা করবার মত পয়সা নেই।”

প্রফুল্ল রায় হাসিয়া উঠিল। এক একজন লোক আছে, যাহাদের মুখ দেখিতে বেশ সুশ্রী, কিন্তু হাসিলেই মুখের চেহারা বদলাইয়া যায়। দেখিলাম, প্রফুল্ল রায়েরও তাহাই হইল। লোকটি বোধ হয় অতিরিক্ত পানখোর, কারণ, দাঁতগুলা পানের রসে রক্তাভ হইয়া আছে। সুন্দর মুখ এত সহজে এমন বিকৃত হইতে পারে দেখিয়া আশ্চর্য্য বোধ হয়।

প্রফুল্ল রায় হাসিতে হাসিতে বলিল,—“আমি বীমা কোম্পানীর লোক বটে, কিন্তু ঠিক বীমার কাজে আপনাদের কাছে আসিনি। অবশ্য আজকাল আমাদের আসতে দেখলে আত্মীয়-স্বজনরাও দোরে খিল দিতে আরম্ভ করেছেন; নেহাৎ দোষ দেওয়াও যায় না। কিন্তু আপনারা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, উপস্থিত আমার কোনও দুরভিসন্ধি নেই। —আপনারই নাম ব্যোমকেশ বাবু?—বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ? আপনার কাছে একটু প্রাইভেট পরামর্শ নিতে এসেছি, মশায়। যদি আপত্তি না থাকে—”

ব্যোমকেশ বেজারভাবে মুখখানা বাঁকাইয়া বলিল,—“পরামর্শ নিতে হ'লে অগ্রিম কিছু দর্শনী দিতে হয়।”

প্রফুল্ল রায় তৎক্ষণাৎ মনিব্যাগ হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া টেবলের উপর রাখিয়া বলিল,—“আমার কথা অবশ্য গোপনীয় কিছু নয়, তবু—” বলিয়া অর্থপূর্ণভাবে আমার পানে চাহিল।

আমি উঠিবার উপক্রম করিতেছি দেখিয়া ব্যোমকেশ বেশ একটু কড়া সুরে বলিল,—“উনি আমার সহকারী এবং বন্ধু। যা বলবেন, ওঁর সামনেই বলুন।”

প্রফুল্ল রায় বলিল,—"বেশ ত, বেশ ত। উনি যখন আপনার সহকারী, তখন আর আপত্তি কিসের? আপনার নামটি—? মাফ করবেন অজিত বাবু, আপনি যে ব্যোমকেশ বাবুর বন্ধু, তা আমি বুঝতে পারি নি। আপনি ভাগ্যবান্ লোক মশায়, সর্ব্বদা এত বড় একজন ডিটেক্‌টিভের সঙ্গে সঙ্গে থাকা, কত রকম crimeএর মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে সাহায্য করা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। আপনার জীবনের একটা মুহূর্ত্তও বোধ হয় dull নয়! আমার এক এক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে বীমার কাজ ছেড়ে আপনার মত জীবন যাপন করতে যদি পারতাম—" বলিয়া পকেট হইতে পাণের ডিবা বাহির করিয়া একটা পান মুখে দিল।

ব্যোমকেশ ক্রমেই অধীর হইয়া উঠিতেছিল, বলিল,—"এইবার আপনার পরামর্শের বিষয়টা যদি প্রকাশ ক'রে বলেন,—তা হ'লে সব দিক্ দিয়েই স্থবিধে হয়।"

প্রফুল্ল রায় তাড়াতাড়ি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল,—"এই যে বলি। —আমি বীমা কোম্পানীর এজেণ্ট, তা ত আগেই শুনেছেন। বম্বের জুয়েল ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর তরফ থেকে আমি কাজ করি! কোম্পানীর হয়ে দশ বারো লাখ টাকার কাজ আমি করেছি, তাই কোম্পানী খুসী হয়ে আমাকে কল্‌কাতা অফিসের চার্জ্জ দিয়ে পাঠিয়েছেন। গত আট মাস আমি স্থায়িভাবে কলকাতাতেই আছি।

"প্রথম মাস তুই বেশ কাজ চালিয়েছিলাম মশাই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে এক আপদ এসে জুটল। কারুর নাম করবার দরকার নেই, কিন্তু অন্য বীমা কোম্পানীর একটা লোক আমার পেছনে লাগল। চুনো-পুঁটির কারবার আমি করি না, চার হাজারের কাজ আমার অধীনস্থ এজেণ্টরাই করে, কিন্তু বড় বড় খদ্দেরের বেলা আমি নিজে কাজ করি। এই লোকটা আমার বড় বড় খদ্দের—ভাল ভাল লাইফ—ভাঙাতে আরম্ভ

করলে। আমি যেখানে যাই, আমার পেছু পেছু সে-ও সেখানে গিয়ে হাজির হয়—কোম্পানীর নামে নানারকম দুর্নাম দিয়ে খদ্দের ভড়কে দেয়। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়ালো যে, বড় বড় লাইফগুলো আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল।

"এই ভাবে চার পাঁচ মাস কাটল। কোম্পানী থেকে তাগাদা আস্‌তে লাগল, কিন্তু কি করব, কেমন ক'রে লোকটার হাত থেকে ব্যবসা বাঁচাব, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না। মামলা-মোকদ্দমা করাও সহজ নয়—তাতে কোম্পানীর ক্ষতি হয়। অথচ ছিনে জোঁক পেছনে লেগেই আছে। আরও মাস খানেক কেটে গেল লোকটাকে জব্দ করবার কোনও উপায়ই ভেবে পেলাম না।"

প্রফুল্ল রায় মনি-ব্যাগ হইতে সযত্নে রক্ষিত দুটি চিরকুট বাহির করিয়া ছোট টুকরাটি ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল,—"দিন বারো চোদ্দ আগে এই বিজ্ঞাপনটি হঠাৎ চোখে পড়ল। আপনার নজরে বোধ হয় পড়েনি, পড়বার কথাও নয়। কিন্তু পাঁচ লাইনের বিজ্ঞাপন হ'লে কি হয়, মশাই, পড়বামাত্র আমার প্রাণটা লাফিয়ে উঠল! পথের কাঁটা আর কাকে বলে? ভাবলাম, দেখি ত আমার পথের কাঁটা উদ্ধার হয় কি না! মনের তখন এমনই অবস্থা যে, স্বপ্নাদ্য মাদুলী হলেও বোধ করি আপত্তি করতাম না।"

গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, এ সেই পথের কাঁটার বিজ্ঞাপনের কাটিং। প্রফুল্ল রায় বলিল,—"পড়লেন ত? বেশ মজার নয়? যা হোক, আমি ত নির্দ্দিষ্ট দিনে অর্থাৎ গত শনিবারের আগের শনিবারে—কদমতলায় কেষ্ট ঠাকুরের মত ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে গিয়ে দাঁড়ালাম। সে অস্বস্তির কথা আর কি বলব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে ঝিঁঝি ধ'রে গেল, কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—কোথাও কেউ নেই। ডিস্‌গ্যস্‌টেড হয়ে ফিরে আসছি, হঠাৎ দেখি, পকেটে একখানা চিঠি!"

দ্বিতীয় কাগজখানা ব্যোমকেশকে দিয়া বলিল,—"এই দেখুন সে চিঠি।"

ব্যোমকেশ চিঠিখানা খুলিয়া পড়িতে লাগিল, আমি উঠিয়া আসিয়া তাহার পিঠের উপর ঝুঁকিয়া দেখিলাম—ঠিক আমারই পত্রেরই অনুরূপ, কেবল রবিবারের পরিবর্ত্তে আগামী শনিবার ১১ই মার্চ্চ রাত্রি বারোটার সময় সাক্ষাৎ করিবার নির্দ্দেশ আছে।

প্রফুল্ল রায় একটু থামিয়া চিঠিখানা পড়িবার অবকাশ দিয়া বলিতে লাগিল,—"একে ত পকেটে চিঠি এল কি ক'রে, ভেবেই পেলাম না, তার ওপর চিঠি প'ড়ে অজানা আতঙ্কে বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল। আমি মিষ্টি ভালবাসি না মশাই, কিন্তু এ চিঠির যেন আগাগোড়াই মিষ্টি। যেন কি একটা ভয়ঙ্কর অভিসন্ধি এর মধ্যে লুকোনো রয়েছে। নইলে সব তাতেই এত লুকোচুরি কেন? লোকটা কে, কি রকম প্রকৃতি, কিছুই জানি না, তার চেহারাও দেখি নি, অথচ সে আমাকে রাত দুপুরে একটা নির্জ্জন রাস্তা দিয়ে একলা যেতে বলেছে। ভয়ঙ্কর সন্দেহের কথা নয় কি? আপনিই বলুন ত?"—বলিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আমি উত্তর দিবার পূর্ব্বেই ব্যোমকেশ বলিল,—"উনি কি মনে করেন সে প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন! আপনি কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান, তাই বলুন।"

প্রফুল্ল রায় একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা করছি। চিঠির লেখককে চিনি না অথচ তার ভাবগতিক দেখে সন্দেহ হয়, লোক ভাল নয়। এ রকম অবস্থায় চিঠির উত্তর নিয়ে আমার যাওয়া উচিত হবে কি? আমি নিজে গত দশ বারো দিন ধ'রে ভেবে কিছুই ঠিক করতে পারি নি; অথচ যেতে হ'লে মাঝে আর একটি দিন বাকি। তাই কি করব ঠিক করতে না পেরে আপনার পরামর্শ নিতে এসেছি।"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"দেখুন, আজ আমি

আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে পারলুম না। আপনি এই কাগজ দু'খানা রেখে যান, এখনও যথেষ্ট সময় আছে, কাল সকালে বিবেচনা ক'রে আমি আপনাকে যথাকর্ত্তব্য ব'লে দেব।"

প্রফুল্ল রায় বলিল,—"কিন্তু কাল সকালে ত আমি আস্‌তে পারব না, আমাকে এক যায়গায় যেতে হবে। আজ রাত্রে সুবিধা হবে না কি? মনে করুন, আটটা কি নটা'র সময় যদি আসি?"

ব্যোমকেশ মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না, আজ রাত্রে আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকব—আমাকেও এক জায়গায় যেতে হবে—" বলিয়া ফেলিয়াই সচকিতে প্রফুল্ল রায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল,—"কিন্তু আপনার ব্যস্ত হবার কোনও কারণ নেই, কাল বিকেলে চারটে সাড়ে চারটের সময় এলেও যথেষ্ট সময় থাকবে।"

"বেশ তাই আসব—" পকেট হইতে আবার ডিবা বাহির করিয়া দুটা পান মুখে পুরিয়া ডিবাটা আমাদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"পান খান কি? খান না!—আমার এই একটা বদ্ অভ্যাস কিছুতেই ছাড়তে পারি না; ভাত না খেলেও চলে, কিন্তু পানের অভাবে পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যায়। আচ্ছা—আজ উঠি তা হ'লে, নমস্কার।"

আমরা প্রতিনমস্কার করিলাম। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া রায় ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"পুলিসে এ বিষয়ে খবর দিলে কেমন হয়? আমার ত মনে হয়, পুলিস যদি তদন্ত করে' লোকটার নামধাম বিবরণ বের করতে পারে?"

ব্যোমকেশ হঠাৎ মহা খাপ্পা হইয়া উঠিয়া বলিল,—"পুলিসের সাহায্য যদি নিতে চান, তা হ'লে আমার কাছে কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করবেন না। আমি আজ পর্য্যন্ত পুলিসের সঙ্গে কাজ করি নি, করবও না—এই নিয়ে যান আপনার টাকা।" বলিয়া টেবলের উপর নোটখানা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

"না না, আমি আপনার মতামত জানতে চেয়েছিলাম মাত্র। তা আপনার যখন মত নেই, আচ্ছা, আসি তা হ'লে—" বলিতে বলিতে প্রফুল্ল রায় দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

প্রফুল্ল রায় চলিয়া গেলে ব্যোমকেশও নোটখানা তুলিয়া লইয়া নিজের লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকিল, তারপর সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সে মাঝে মাঝে অকারণে খিটখিটে হইয়া উঠে বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ একাকী থাকিবার পর সেভাব আপনিই তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা আমি জানিতাম। তাই মনটা বহু প্রশ্ন কণ্টকিত হইয়া থাকিলেও অপঠিত সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইয়া তাহাতে মনঃসংযোগের চেষ্টা করিলাম।

কয়েক মিনিট পরে শুনিতে পাইলাম, ব্যোমকেশ পাশের ঘরে কথা কহিতেছে। বুঝিলাম, কাহাকেও টেলিফোন করিতেছে। দু'একটা ইংরাজী শব্দ কানে আসিল; কিন্তু কাহাকে টেলিফোন করিতেছে, ধরিতে পারিলাম না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরিয়া কথাবার্ত্তা চলিল, তারপর দরজা খুলিয়া ব্যোমকেশ বাহির হইয়া আসিল। চাহিয়া দেখিলাম, তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাকে ফোন করলে?"

সে কথার উত্তর না দিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"কাল এস্‌প্ল্যানেড্‌ থেকে ফেরবার সময় এক জন তোমার পেছু নিয়েছিল জানো?"

আমি চকিত হইয়া বলিলাম,—"না! নিয়েছিল নাকি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"নিয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু লোকটার কি অসীম দুঃসাহস, আমি শুধু তাই ভাবছি।" বলিয়া নিজের মনেই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

আমাকে অনুসরণ করার মধ্যে এতবড় দুঃসাহসিকতা কি আছে, তাহা বুঝিলাম না; কিন্তু ব্যোমকেশের কথা মাঝে মাঝে এমন দুরূহ হেঁয়ালির মত হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহার অর্থবোধের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র।

অথচ এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করাও বৃথা, সময় উপস্থিত না হইলে সে কিছুই বলিবে না। তাই আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্নানাদির জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যাবেলাটা ব্যোমকেশ নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়াই কাটাইয়া দিল। প্রফুল্ল রায় সম্বন্ধে দু' একটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে শুনিতেই পাইল না, চেয়ারে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল; শেষে চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"প্রফুল্ল রায়? ও, আজ সকালে যিনি এসেছিলেন? না, তাঁর সম্বন্ধেও এখনও কিছু ভেবে দেখি নি।"

রাত্রিকালে আহারাদির পর নীরবে বসিয়া ধূমপান চলিতেছিল, ঘড়ীতে ঠং করিয়া সাড়ে দশটা বাজিতেই ব্যোমকেশ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল'—এবার সাজসজ্জার আয়োজন আরম্ভ করা যাক, নইলে অভিসারিকাদের সঙ্কেতস্থলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"সে আবার কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"বাঃ, 'পথের কাঁটা'র নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে, মনে নেই?"

আমি আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"মাফ কর। এই রাত্রে একলা আমি সেখানে যেতে পারব না। যেতে হয়, তুমি যাও।"

"আমি ত যাবই, তোমারও যাওয়া চাই।"

"কিন্তু না গেলেই কি নয়? 'পথের কাঁটা'র সম্বন্ধে এত মিথ্যে কৌতূহল কেন? তার চেয়ে যদি গ্রামোফোন পিনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে, তা হ'লে যে ঢের কাজ হ'ত।"

"হয় ত হ'ত। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কৌতূহল চরিতার্থ করলেই বা মন্দ কি? গ্রামোফোন পিন ত আর পালাচ্ছে না। তা ছাড়া কাল প্রফুল্ল রায় পরামর্শ নিতে আসবে, তাকে পরামর্শ দেবার কিছু খবর ত চাই।"

"কিন্তু দু'জনে গেলে ত হবে না। চিঠিতে যে মাত্র এক জনকে যেতে বলেছে।"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন ওঘরে চল, সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে আসছে।"

লাইব্রেরীতে লইয়া গিয়া ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে আমার মুখসজ্জা করিয়া দিল। দেয়ালে লম্বিত দীর্ঘ আয়নাটায় উঁকি মারিয়া দেখিলাম, সেই গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ইন্দ্রজালপ্রভাবে ফিরিয়া পাইয়াছি, কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যোমকেশ নিজের বেশভূষা আরম্ভ করিল; মুখের কোনও পরিবর্ত্তন করিল না, দেরাজ হইতে কালো রঙের সাহেবী পোষাক বাহির করিয়া পরিধান করিল, পায়ে কালো রবারসোল্ জুতা পরিল। তারপর আমাকে আয়নার সম্মুখে পাঁচ ছয় হাত দূরে দাঁড় করাইয়া নিজে আমার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল,—"আয়নায় আমাকে দেখতে পাচ্ছ?"

"না।"

"বেশ। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাও—এবার দেখতে পেলে?"

"না।"

"ব্যস—কাম ফতে। এখন শুধু একটি পোষাক পরতে বাকী আছে।"

"আবার কি?"

ঘরে ঢুকিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের টেবলের উপর দু'টি চীনামাটির প্লেট রাখা আছে—হোটেলে যেরূপ আকৃতির প্লেটে মটন্ চপ খাইতে দেয়, সেইরূপ। সেই প্লেট একখানা ব্যোমকেশ আমার বুকের উপর উপুড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া চওড়া ন্যাকড়ার ফালি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া দিল। বলিল,—"সাবধান, খসে না যায়। ওর ওপর কোট পরলেই আর কিছু দেখা যাবে না।"

আমি ঘোর বিস্ময়ে বলিলাম,—"এ সব কি হচ্ছে?"

অথচ এ বিষয়ে তাহাকে প্রশ্ন করাও বৃথা, সময় উপস্থিত না হইলে সে কিছুই বলিবে না। তাই আমি আর বাক্যব্যয় না করিয়া স্নানাদির জন্য উঠিয়া পড়িলাম।

দ্বিপ্রহর ও সন্ধ্যাবেলাটা ব্যোমকেশ নিষ্কর্ম্মার মত বসিয়াই কাটাইয়া দিল। প্রফুল্ল রায় সম্বন্ধে দু' একটা প্রশ্ন করিলাম, কিন্তু সে শুনিতেই পাইল না, চেয়ারে চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া রহিল; শেষে চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—"প্রফুল্ল রায়? ও, আজ সকালে যিনি এসেছিলেন? না, তাঁর সম্বন্ধেও এখনও কিছু ভেবে দেখি নি।"

রাত্রিকালে আহারাদির পর নীরবে বসিয়া ধূমপান চলিতেছিল, ঘড়ীতে ঠং করিয়া সাড়ে দশটা বাজিতেই ব্যোমকেশ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিল,—"উঠ বীরজায়া বাঁধ কুন্তল'—এবার সাজসজ্জার আয়োজন আরম্ভ করা যাক, নইলে অভিসারিকাদের সঙ্কেতস্থলে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে।"

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"সে আবার কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"বাঃ, 'পথের কাঁটা'র নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে, মনে নেই?"

আমি আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম,—"মাফ কর। এই রাত্রে একলা আমি সেখানে যেতে পারব না। যেতে হয়, তুমি যাও।"

"আমি ত যাবই, তোমারও যাওয়া চাই।"

"কিন্তু না গেলেই কি নয়? 'পথের কাঁটা'র সম্বন্ধে এত মিথ্যে কৌতূহল কেন? তার চেয়ে যদি গ্রামোফোন পিনের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে, তা হ'লে যে ঢের কাজ হ'ত।"

"হয় ত হ'ত। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা কৌতূহল চরিতার্থ করলেই বা মন্দ কি? গ্রামোফোন পিন ত আর পালাচ্ছে না। তা ছাড়া কাল প্রফুল্ল রায় পরামর্শ নিতে আসবে, তাকে পরামর্শ দেবার কিছু খবর ত চাই।"

"কিন্তু দু'জনে গেলে ত হবে না। চিঠিতে যে মাত্র এক জনকে যেতে বলেছে।"

"তার ব্যবস্থা আমি করেছি। এখন ওঘরে চল, সময় ক্রমেই সংক্ষেপ হয়ে আসছে।"

লাইব্রেরীতে লইয়া গিয়া ব্যোমকেশ ক্ষিপ্রহস্তে আমার মুখসজ্জা করিয়া দিল। দেয়ালে লম্বিত দীর্ঘ আয়নাটায় উঁকি মারিয়া দেখিলাম, সেই গোঁফ এবং ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ইন্দ্রজালপ্রভাবে ফিরিয়া পাইয়াছি, কোথাও এতটুকু তফাৎ নাই। আমাকে ছাড়িয়া দিয়া ব্যোমকেশ নিজের বেশভূষা আরম্ভ করিল; মুখের কোনও পরিবর্ত্তন করিল না, দেরাজ হইতে কালো রঙের সাহেবী পোষাক বাহির করিয়া পরিধান করিল, পায়ে কালো রবারসোল্ জুতা পরিল। তারপর আমাকে আয়নার সম্মুখে পাঁচ হাত দূরে দাঁড় করাইয়া নিজে আমার পিছনে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল,—"আয়নায় আমাকে দেখতে পাচ্ছ?"

"না।"

"বেশ। এখন সামনের দিকে এগিয়ে যাও—এবার দেখতে পেলে?"

"না।"

"ব্যস—কাম ফতে। এখন শুধু একটি পোষাক পরতে বাকী আছে।"

"আবার কি?"

ঘরে ঢুকিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলাম, ব্যোমকেশের টেবলের উপর দু'টি চীনামাটির প্লেট রাখা আছে—হোটেলে যেরূপ আকৃতির প্লেটে মটন্ চপ খাইতে দেয়, সেইরূপ। সেই প্লেট একখানা ব্যোমকেশ আমার বুকের উপর উপুড় করিয়া চাপিয়া ধরিয়া চওড়া ন্যাকড়ার ফালি দিয়া শক্তভাবে বাঁধিয়া দিল। বলিল,—"সাবধান, খসে না যায়। ওর ওপর কোট পরলেই আর কিছু দেখা যাবে না।"

আমি ঘোর বিস্ময়ে বলিলাম,—"এ সব কি হচ্ছে?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"অভিসারে চলেছ, কঞ্চুকী না পরলে চলবে কেন। ভয় নেই, আমিও পরছি।"

দ্বিতীয় প্লেটখানা ব্যোমকেশ নিজের ওয়েষ্ট কোটের ভিতরে পূরিয়া বোতাম লাগাইয়া দিল, বাঁধিবার প্রয়োজন হইল না।

এইরূপ বিচিত্র প্রসাধন শেষ করিয়া রাত্রি এগারটা কুড়ি মিনিটের সময় আমরা বাহির হইলাম। দেরাজ হইতে, কয়েকটা জিনিষ পকেটে পূরিতে পূরিতে ব্যোমকেশ বলিল, চিঠি নিয়েছ? কি সর্ব্বনাশ, নাও নাও, শীগ্‌গির একখানা সাদা কাগজ খামের মধ্যে পূরে নাও—"

শিয়ালদহের মোড়ের উপর একটা খালি ট্যাক্সি পাইয়া তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। পথ জন-বিরল, দোকান-পাট প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের ট্যাক্সি নির্দ্দেশমত হু হু করিয়া চৌরঙ্গীর দিকে ছুটিয়া চলিল।

কালীঘাট ও খিদিরপুরের ট্রাম-লাইন যেখানে বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে, সেই স্থানে ট্যাক্সি হইতে নামিলাম। ট্যাক্সি-চালক ভাড়া লইয়া হর্ণ বাজাইয়া চলিয়া গেল। চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, প্রশস্ত রাজপথের উপর কোথাও একটি লোক নাই, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য উজ্জ্বল দীপ যেন এই প্রাণহীন নিস্তব্ধভাবকে ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছে। ঘড়ীতে তখনও বারোটা বাজিতে দশ মিনিট বাকী।

কি করিতে হইবে, গাড়ীতে বসিয়া পরামর্শ করিয়া লইয়াছিলাম। সুতরাং কথা বলিবার প্রয়োজন হইল না। আমি আগে আগে চলিলাম, ব্যোমকেশ ছায়ার মত আমার পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাহার কালো পরিচ্ছদ ও শব্দহীন জুতা আমার কাছেও যেন তাহাকে কায়াহীন করিয়া তুলিল। আমার পায়ের সঙ্গে পা মিলাইয়া সে আমার ঠিক ছয় ইঞ্চি পশ্চাতে চলিয়াছে, তবু মনে হইল, যেন আমি একাকী! রাস্তার আলো অতি বিস্তৃত পথকে আলোকিত করিয়াছে বটে, কিন্তু সে আলো খুব স্পষ্ট ও তীব্র নহে। পথের দুই পাশে প্রাসাদ থাকিলে আলো

প্রতিফলিত হইয়া উজ্জ্বলতর হয়, এখানে তাহা হইতেছে না। দুই দিকের শূন্যতা যেন আলোর অর্দ্ধেক তেজ গ্রাস করিয়া লইতেছে।

এই অবস্থায় সম্মুখ হইতে আসিয়া কাহারও সাধ্য নাই যে বুঝিতে পারে, আমি একা নহি, আমার পশ্চাতে আর একটি অন্ধকার মূর্ত্তি নিঃশব্দে চলিয়াছে।

পাশের ট্রাম-লাইনে ট্রামের যাতায়াত বহু পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এ দিকে রেস্‌কোর্সের শাদা রেলিং একটানা ভাবে চলিয়াছে। আমি রাস্তার মাঝখান ধরিয়া হাঁটিয়া চলিলাম। দূরে পশ্চাতে একটা ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া মধ্যরাত্রি ঘোষিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সহরের অন্য ঘড়ীগুলাও বাজিতে আরম্ভ করিল, মধ্যরাত্রির স্তব্ধতা নানা প্রকার সুমিষ্ট শব্দে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল।

ঘড়ীর শব্দ মিলাইয়া যাইবার পর কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"এইবার চিঠিখানা হাতে নাও।"

ব্যোমকেশ যে পিছনে আছে, তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। চমকিয়া পকেট হইতে খামখানা বাহির করিয়া হাতে লইলাম।

আরও ছয় সাত মিনিট চলিলাম। খিদিরপুর পুল পৌঁছিতে তখনও প্রায় অর্দ্ধেক পথ বাকী আছে, এমন সময় সম্মুখে বহু দূরে একটা ক্ষীণ আলোক-বিন্দু দেখিয়া সচকিত হইয়া উঠিলাম। কানের কাছে শব্দ হইল,—"আস্‌ছে—তৈরী থাকো।"

আলোকবিন্দু উজ্জ্বলতর হইতে লাগিল। মিনিটখানেকের মধ্যেই দেখা গেল, পিচ-ঢালা কালো রাস্তার উপর কৃষ্ণতর একটা বস্তু দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই বাইসিক্ল-আরোহীর মূর্ত্তি স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমি দাঁড়াইয়া পড়িয়া খাম সমেত হাতখানা পাশের দিকে বাড়াইয়া দিলাম। সম্মুখে বাইসিক্লের গতিও মন্থর হইল।

রুদ্ধ-নিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। বাইসিক্ল পঁচিশ গজের

মধ্যে আসিল ; তখন দেখিতে পাইলাম, কালো স্যুটপরিহিত আরোহী সম্মুখে ঝুঁকিয়া মোটর-গগ্‌লের ভিতর দিয়া আমাকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেখিতেছে।

মধ্যম-গতিতে সাইক্ল যেন আমাকে লক্ষ্য করিয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের মধ্যে যখন আর দশ গজ মাত্র ব্যবধান, তখন কড়াং কড়াং করিয়া সাইক্লের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে বুকে দারুণ ধাক্কা খাইয়া আমি প্রায় উল্টাইয়া পড়িয়া গেলাম। আমার বুকে বাঁধা প্লেটটা শত খণ্ডে ভাঙিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

তার পর নিমেষের মধ্যে একটা কাণ্ড হইয়া গেল। আমি টলিয়া পড়িতেই ব্যোমকেশ বিদ্যুদ্বেগে সম্মুখদিকে লাফাইয়া পড়িল। বাইসিক্ল-আরোহী আমার পশ্চাতে আর একটা লোকের জন্য একবারেই প্রস্তুত ছিল না, তবু সে পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। ব্যোমকেশ তাহাকে এক ঠেলায় বাইসিক্ল সমেত ফেলিয়া দিয়া বাঘের মত তাহার ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িল।

আমি মাটী হইতে উঠিয়া ব্যোমকেশের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সে প্রতিপক্ষের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে এবং দুই বজ্র-মুষ্টিতে তাহার দুই কব্জি ধরিয়া আছে। বাইসিক্লখানা একধারে পড়িয়াছে।

আমি পৌঁছিতেই ব্যোমকেশ বলিল,—"অজিত, আমার পকেট থেকে সিল্কের দড়ি বার ক'রে এর হাত দুটো বাঁধো—খুব জোরে।"

লিকলিকে সরু রেশমের দড়ি ব্যোমকেশের পকেট হইতে বাহির করিয়া ভূপতিত লোকটার হাত দুটা শক্ত করিয়া বাঁধিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—"ব্যস্, হয়েছে। অজিত, ভদ্রলোকটিকে চিন্‌তে পাচ্ছ না? ইনি আমাদের সকালবেলার বন্ধু প্রফুল্ল রায়! আরও ঘনিষ্ঠ পরিচয় যদি চাও, ইনিই গ্রামোফোন পিন রহস্যের মেঘনাদ!" বলিয়া তাহার চোখের গগ্‌ল খুলিয়া লইল।

অতঃপর আমার মনের অবস্থা কিরূপ হইল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু সেই অবস্থাতে থাকিয়াও প্রফুল্ল রায় হিংস্র দন্তপংক্তি বাহির করিয়া হাসিল, বলিল,—"ব্যোমকেশ বাবু, এবার আমার বুকের উপর থেকে নেমে বসতে পারেন, আমি পালাব না।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"অজিত, এর পকেটগুলো ভাল ক'রে দেখে নাও ত অস্ত্র-শস্ত্র কিছু আছে কিনা।"

এক পকেট হইতে একটা অপেরা গ্লাস ও অন্য পকেট হইতে পানের ডিবা বাহির হইল, আর কিছুই নাই। ডিবা খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে তখনও গোটা চারেক পান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বুকের উপর হইতে নামিলে প্রফুল্ল রায় উঠিয়া বসিল, ব্যোমকেশের মুখের দিকে কিছুক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"ব্যোমকেশ বাবু, আপনি আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান্। কারণ, আমি আপনার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করেছিলাম, কিন্তু আপনি করেন নি। শত্রুর শক্তিকে তুচ্ছ করতে নেই, এ শিক্ষা একটু দেরিতে পেলাম, কাজে লাগাবার ফুরসত হবে না।" বলিয়া ক্লিষ্টভাবে হাসিল।

ব্যোমকেশ নিজের বুক-পকেট হইতে একটা পুলিস হুইস্‌ল বাহির করিয়া সজোরে তাহাতে ফুঁ দিল, তার পর আমাকে বলিল,—"অজিত, বাইসিক্লখানা তুলে সরিয়ে রাখো। কিন্তু সাবধান, ওর ঘণ্টিতে হাত দিও না, বড় ভয়ানক জিনিস!"

প্রফুল্ল রায় হাসিল,—"সবই জানেন দেখছি, আপনি অসাধারণ লোক। আপনাকেই ভয় ছিল, তাই ত আজ এই ফাঁদ পেতেছিলাম। ভেবেছিলাম, আপনি একলা আসবেন, নিভৃতে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু আপনি সব দিক দিয়েই দাগা দিলেন। ভাল অভিনয় করতে পারি ব'লে আমার অহঙ্কার ছিল; কিন্তু আপনি আরও উচ্চশ্রেণীর আর্টিষ্ট। আপনি আমার ছদ্মবেশ খুলে আমার মনটাকে উলঙ্গ ক'রে আজ

সকালবেলা দেখে নিয়েছিলেন আর আমি শুধু আপনার মুখোসটাই দেখেছিলাম! যাক, গলাটা বেজায় শুকিয়ে গেছে। একটু জল পাব কি?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"জল এখানে নেই, থানায় গিয়ে পাবেন?"

প্রফুল্ল রায় ক্লিষ্ট হাসিয়া বলিল,—"তাও ত বটে, জল এখানে পাওয়া যায় কোথা!" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পানের ডিবাটার দিকে একটা সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—"একটা পান পেতে পারি না কি? অবশ্য আসামীকে পান খাওয়াবার রীতি নেই সে আমি জানি, কিন্তু পেলে তৃষ্ণাটা নিবারণ হ'ত।"

ব্যোমকেশ আমাকে ইঙ্গিত করিল, আমি ডিবা হইতে দু'টা পান তাহার মুখে পূরিয়া দিলাম। পান চিবাইতে চিবাইতে প্রফুল্ল রায় বলিল, —"ধন্যবাদ; বাকী দুটো আপনারা ইচ্ছা করলে খেতে পারেন।"

ব্যোমকেশ উৎকর্ণভাবে পুলিসের আগমনশব্দ শুনিতেছিল, অন্যমনস্কভাবে মাথা নাড়িল। দূরে মোটর-বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ শুনা গেল। প্রফুল্ল রায় বলিল,—"পুলিস ত এসে পড়ল। আমাকে তা হ'লে ছাড়বেন না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"ছাড়ব কি রকম?"

প্রফুল্ল রায় ঘোলাটে রকম হাসিয়া পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিল,—পুলিসে দেবেনই?"

"দেব বৈকি!"

"ব্যোমকেশ বাবু, বুদ্ধিমান্ লোকেরও ভুল হয়। আপনি আমাকে পুলিসে দিতে পারবেন না—" বলিয়া রাস্তার উপর ঢলিয়া পড়িল।

একটা মোটর বাইক সশব্দে আসিয়া পাশে থামিল, এক জন ইউনিফর্ম্ম-পরা সাহেব তাহার উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বলিল,—"What's up? Dead?"

প্রফুল্ল রায় নিষ্প্রভ চক্ষু খুলিয়া বলিল,—"এ যে খোদ কর্ত্তা দেখছি! টু লেট্ সাহেব, আমায় ধরতে পারলে না। ব্যোমকেশ বাবু, পানটা খেলে ভাল করতেন, একসঙ্গে যাওয়া যেত। আপনার মত লোককে ফেলে যেতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছে!" হাসিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া প্রফুল্ল রায় চক্ষু মুদিল। তাহার মুখখানা হঠাৎ শক্ত হইয়া গেল।

ইতিমধ্যে একলরী পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কমিশনার সাহেব নিজে হাতকড়ি লইয়া অগ্রসর হইতেই ব্যোমকেশ প্রফুল্ল রায়ের মাথার শিয়র হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"হাতকড়ার দরকার নেই। আসামী পালিয়েছে!"

আমি আর ব্যোমকেশ আমাদের চিরাভ্যস্ত বসিবার ঘরটিতে মুখোমুখি চেয়ারে বসিয়াছিলাম। খোলা জানালা দিয়া সকালবেলার আলো ও বাতাস ঘরে ঢুকিতেছিল। ব্যোমকেশ একটি বাইসিক্লের বেল্ হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতেছিল। টেবলের উপর একখানা সরকারী খাম খোলা অবস্থায় পড়িয়াছিল।

ব্যোমকেশ ঘন্টির মাথাটা খুলিয়া ফেলিয়া ভিতরের যন্ত্রপাতি সপ্রশংস নেত্রে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"কি অদ্ভুত লোকটার মাথা। এ রকম একটা যন্ত্র যে তৈরী করা যায়, এ কল্পনাও বোধ করি আজ পর্য্যন্ত কারু মাথায় আসে নি। এই যে পাকানো স্প্রিং দেখছ, এটি হচ্ছে এই বন্দুকের বারুদ,—কি নিদারুণ শক্তি স্প্রিংএর! কি ভয়ঙ্কর অথচ কি সহজ। এই ছোট্ট ফুটোটি হচ্ছে এর নল,—যে পথ দিয়ে গুলী বেরোয়। আর এই ঘোড়া টিপলে দু' কাজ একসঙ্গে হয়, ঘন্টিও বাজে, গুলিও বেরিয়ে যায়। ঘন্টির শব্দে স্প্রিংএর আওয়াজ চাপা পড়ে। মনে আছে

—সে দিন কথা হয়েছিল—শব্দে শব্দ ঢাকে, গন্ধ ঢাকে কিসে? এই লোকটা যে কত বড় বুদ্ধিমান্‌, সেই দিন তার ইঙ্গিত পেয়েছিলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আচ্ছা, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন যে একই লোক, এ তুমি বুঝলে কি করে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রথমটা বুঝতে পারি নি। কিন্তু ক্রমশঃ যেন নিজের অজ্ঞাতসারে ও দুটো মিলে এক হয়ে গেল। দেখ, পথের কাঁটা কি বলছে? সে খুব পরিষ্কার করেই বলছে যে, যদি তোমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের পথে কোনও প্রতিবন্ধক থাকে ত সে তা দূর ক'রে দেবে—অবশ্য কাঞ্চন বিনিময়ে? পারিশ্রমিকের কথাটা স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও এটা যে তার অনাহারী পরহিতৈষা নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। তার পর এ দিকে দেখ, যাঁরা গ্রামোফোন পিনের ঘায়ে মরেছেন, তাঁরা সকলেই কারুর না কারুর সুখের পথে কাঁটা হয়ে বেঁচেছিলেন! আমি মৃত ব্যক্তিদের আত্মীয়-স্বজনের ওপর কোনও ইঙ্গিত করতে চাই না, কারণ যে কথা প্রমাণ করা যাবে না, সে কথা ব'লে কোনও লাভ নেই। কিন্তু এটাও লক্ষ্য না ক'রে থাকা যায় না যে, মৃত ব্যক্তিরা সকলেই অপুত্রক ছিলেন, তাঁদের উত্তরাধিকারী কোনও ক্ষেত্রে ভাগ্নে, কোনও ক্ষেত্রে ভাইপো, কোনও ক্ষেত্রে বা জামাই। আশু বাবু এবং তাঁর রক্ষিতার উপাখ্যান থেকে এই ভাইপো-ভাগ্নে-জামাইদের মনোভাব কতক বোঝা যায় না কি!

"তবেই দেখা যাচ্ছে, পথের কাঁটা আর গ্রামোফোন পিন বাইরে পৃথক হলেও বেশ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে জোড় লেগে যাচ্ছে—ভাঙা পাথরবাটির দুটো অংশ কেমন সহজে জোড় লেগে যায়। আর একটা জিনিস প্রথম থেকেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল—একটার নামের সঙ্গে অন্যটার কাজের সাদৃশ্য। এ দিকে 'পথের কাঁটা' নাম দিয়ে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে আর ও দিকে পথের ওপর কাঁটার মতই একটা পদার্থ

দিয়ে মানুষকে খুন করা হচ্ছে। মিলটা সহজেই চোখে পড়ে না কি?"

আমি বলিলাম,—"হয় ত পড়ে, কিন্তু আমার পড়ে নি।"

ব্যোমকেশ অধীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"এ সব ত খুব সহজ অনুমানের বিষয়। আশু বাবুর কেস হাতে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এগুলো আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছিল—লোকটা কে? এইখানেই প্রফুল্ল রায়ের অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রফুল্ল রায়কে যারা টাকা দিয়েছে খুন করবার জন্যে, তারাও জানতে পারে নি, লোকটা কে এবং কি ক'রে সে খুন করে! আত্মগোপন করবার অসাধারণ ক্ষমতাই ছিল তার প্রধান কর্ম্ম। আমি তাকে কস্মিনকালেও ধরতে পারতুম কিনা জানি না, যদি না সে আমার মন বোঝবার জন্যে সেদিন নিজে এসে হাজির হ'ত।

"কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। তুমি যে দিন পথের কাঁটার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ল্যাম্পপোষ্ট ধ'রে দাঁড়িয়েছিলে, সে দিন তোমার ভাবভঙ্গী দেখে তার সন্দেহ হয়। তবু সে তোমাকে চিঠি গছিয়ে দিয়ে গেল, তার পর অলক্ষ্যে তোমার অনুসরণ করলে। তুমি যখন এই বাড়ীতে এসে উঠলে তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে তুমি আমারই দূত। আশু বাবুর কেস আমার হাতে এসেছে, তা সে জান্‌ত, কাজেই তার দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, আমি অনেক কথাই জানতে পেরেছি। অন্য লোক হ'লে কি করত বলা যায় না—হয় ত এ কাজ ছেড়েছুড়ে দিয়ে পালিয়ে যেত; কিন্তু প্রফুল্ল রায়ের অসীম দুঃসাহস—সে আমার মন বুঝতে এল। অর্থাৎ আমি কতটা জানি এবং পথের কাঁটার সম্বন্ধে কি করতে চাই, তাই জানতে এল। এতে তার বিপদের কোন আশঙ্কা ছিল না, কারণ প্রফুল্ল রায়ই যে পথের কাঁটা এবং গ্রামোফোন-পিন, তা জানা

আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং জানলেও তা প্রমাণ করতে পারতুম না! —শুধু একটি ভুল প্রফুল্ল রায় করেছিল।”

“কি ভুল?”

“সে দিন সকালে আমি যে তারই পথ চেয়ে বসেছিলুম, এটা সে বুঝতে পারে নি। সে যে খোঁজ-খবর নিতে আসবেই, এ আমি জানতুম।”

“তুমি জানতে। তবে আসবা-মাত্র তাকে গ্রেপ্তার করলে না কেন?”

“কথাটা নেহাৎ ইয়ের মত বললে, অজিত। তখন তাকে গ্রেপ্তার করলে মানহানির মোকদ্দমায় খেসারৎ দেওয়া ছাড়া আর কোনও লাভ হ'ত না। সে যে খুনি আসামী তার প্রমাণ কিছু ছিল কি? তাকে ধরবার একমাত্র উপায় ছিল—যাকে বলে in the act, রক্তাক্ত হস্তে! আর সেই চেষ্টাই আমি করেছিলুম। বুকে প্লেট বেঁধে দু'জনে যে গিয়েছিলুম, সে কি মিছিমিছি?”

“যা হোক প্রফুল্ল রায় আমার সঙ্গে কথা কয়ে বুঝলে যে আমি অনেক কথাই জানি—শুধু বুঝতে পারলে না যে তাকেও চিনতে পেরেছি। সে মনে মনে ঠিক করলে যে, আমার বেঁচে থাকা আর নিরাপদ নয়। তাই সে আমাকে একরকম নিমন্ত্রণ ক'রে গেল,—যেন রাত্রে রেসকোর্সের পাশের পথ দিয়ে যাই। সে জানত, একবার তোমাকে পাঠিয়ে ঠকেছি, এবার আমি নিজে যাব। কিন্তু একটা বিষয়ে তার খটকা লাগল, আমি যদি পুলিস সঙ্গে নিয়ে যাই। তাই সে পুলিসের প্রসঙ্গ তুললে। কিন্তু পুলিসের নামে আমি এমনি চটে উঠলুম যে, প্রফুল্ল রায় খুসী হয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল; আমাকে মনে মনে খরচের খাতায় লিখে রাখলে।

“বেচারা ঐ একটা ভুল ক'রে সব মাটি ক'রে ফেললে। শেষকালে

তার অনুতাপও হয়েছিল। আমার বুদ্ধিকে অবজ্ঞা করা যে তার উচিত হয় নি, এ কথা সেদিন সে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছিল।”

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—“তোমার মনে আছে, প্রথম যে দিন আশু বাবু আসেন, সে দিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, বুকে ধাক্কা লাগবার সময় কোনও শব্দ শুনেছিলেন কি না? তিনি বলেছিলেন, বাইসিক্লের ঘণ্টির আওয়াজ শুনেছিলেন। তখন সেটা গ্রাহ্য করি নি। আমার হাওড়া ব্রিজের ঐখানটাই জোড়া লাগছিল না! তার পর ‘পথের কাঁটা’র চিঠি যখন পড়লুম এক নিমেষে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমি বলেছিলুম—চিঠিতে একটি কথা পেয়েছি। সে কথাটি কি জানো—বাইসিক্ল!”

“বাইসিক্লের কথা কেন যে তখন পর্য্যন্ত মাথায় ঢোকে নি, এই আশ্চর্য্য। বাস্তবিক, এখন ভেবে দেখলে বোঝা যায় যে, বাইসিক্ল ছাড়া আর কিছুই হ’তে পারত না। এমন সহজে অনাড়ম্বরভাবে খুন করবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। তুমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছ, সামনে একটা বাইসিক্ল পড়ল। বাইসিক্ল-আরোহী তোমাকে স’রে যাবার জন্যে ঘণ্টি দিয়েই পাশ কাটিয়ে চ’লে গেল। তুমিও মাটিতে প’ড়ে পটলোৎপাটন করলে। বাইসিক্ল-আরোহীকে কেউ সন্দেহ করতে পারে না। কারণ, সে দু’হাতে হ্যাণ্ডেল ধ’রে আছে—অস্ত্র ছুঁড়বে কি ক’রে? তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

“একবার পুলিস ভারী বুদ্ধি খেলিয়েছিল, তোমার মনে থাকতে পারে। গ্রামোফোন পিনের শেষ শিকার কেদার নন্দী লালবাজারের মোড়ের উপর মরেছিলেন। তিনি পড়বামাত্র পুলিস সমস্ত ট্রাফিক বন্ধ ক’রে দিয়ে প্রত্যেক লোকের কাপড়-চোপড় পর্য্যন্ত অনুসন্ধান ক’রে দেখেছিল। কিন্তু কিছুই পেলে না। আমার বিশ্বাস, প্রফুল্ল রায়ও সেখানে ছিল এবং তাকেও যথারীতি সার্চ্চ করা হয়েছিল। প্রফুল্ল রায়

তখন মনে মনে খুব হেসেছিল নিশ্চয়। কারণ, তার বাইসিক্ল বেল্‌এর মাথা খুলে দেখ্‌বার কথা কোনও পুলিস-দারোগার মাথায় আসে নি।” বলিয়া ব্যোমকেশ সস্নেহে বেল্‌টি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

টেবলের উপর হইতে সরকারী লম্বা খামখানা হাওয়ায় উড়িয়া আমার পায়ের কাছে পড়িল। সেখানা তুলিয়া টেবলের উপর রাখিয়া দিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—“পুলিস-কমিশনার সাহেব কি লিখেছেন?”

ব্যোমকেশ বলিল,—“অনেক কথা। গোড়াতেই আমাকে পুলিস এবং সরকার বাহাদুরের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দিয়েছেন; তার পর প্রফুল্ল রায় আত্মহত্যা করাতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন; যদিও এতে তাঁর খুসী হওয়াই উচিত ছিল—কারণ, গভর্ণমেণ্টের অনেক খরচ এবং মেহনৎ বেঁচে গেল। যা হোক, সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার যে আমি শীঘ্রই পাব, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ, পুলিস-সাহেব জানিয়েছেন যে, দরখাস্ত করবামাত্র আমার আর্জ্জি মঞ্জুর হবে, তার ব্যবস্থা তিনি করেছেন। প্রফুল্ল রায়ের লাস কেউ সনাক্ত করতে পারে নি, জুয়েল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর লোকরা লাস দেখে বলেছে যে, এ তাদের প্রফুল্ল রায় নয়, তাদের প্রফুল্ল রায় উপস্থিত কর্ম্ম উপলক্ষে যশোহরে আছেন। সুতরাং বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, প্রফুল্ল রায় নামটা ছদ্মনাম। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না, আমার কাছে ও চিরকাল প্রফুল্ল রায়ই থাকবে। চিঠির উপসংহারে পুলিস-সাহেব একটা নিদারুণ কথা লিখেছেন—এই ঘণ্টিটি ফেরৎ দিতে হবে। এটা নাকি গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি।”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—“ওটার ওপর তোমার ভারী মায়া প’ড়ে গেছে—না? কিছুতেই ছাড়তে পারছ না?”

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল,—“সত্যি, দু’হাজার টাকা পুরস্কারের বদলে সরকার বাহাদুর যদি আমাকে এই ঘণ্টিটা বক্‌শিশ করেন, আমি

মোটেই দুঃখিত হই না। যা হোক, প্রফুল্ল রায়ের একটা স্মৃতিচিহ্ন তবু আমার কাছে রইল।"

"কি?"

"ভুলে গেলে? সেই দশ টাকার নোটখানা। সেটাকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবো ভেবেছি। তার দাম এখন আমার কাছে একশ টাকারও বেশী।" বলিয়া ব্যোমকেশ ঘন্টিটা সযত্নে দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল।

সে ফিরিয়া আসিলে আমি তাহাকে একটা প্রশ্ন করিলাম,—"আচ্ছা, ব্যোমকেশ, সত্যি বল, পানের মধ্যে বিষ আছে তুমি জানতে?"

ব্যোমকেশ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"জানা এবং না জানার মাঝখানে একটা অনিশ্চিত স্থান আছে, সেটা সম্ভাবনার রাজ্য।" কিছুক্ষণ পরে আবার বলিয়া উঠিল,—"তুমি কি মনে কর প্রফুল্ল রায় যদি সামান্য খুনির মত ফাঁসি যেত তা হলে ভাল হ'ত? আমার তা মনে হয় না। বরং এমনি ভাবে যাওয়াই তার ঠিক হয়েছে, সে যে কতবড় আর্টিষ্ট ছিল, ধরা পড়েও হাত পা বাঁধা অবস্থায় সে তা দেখিয়ে দিয়ে গেছে।"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম! শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি কোথা দিয়া যে কোথায় গিয়া পৌঁছিতে পারে তাহা দেখিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না।

"চিঠি হ্যায়।"

ডাক-পিয়ন একখানা রেজেষ্ট্রী চিঠি দিয়া গেল। ব্যোমকেশ খাম খুলিয়া ভিতর হইতে কেবল একখানা রঙীন কাগজের টুকরা বাহির করিল, তাহার উপর একবার চোখ বুলাইয়া সহাস্যে আমার দিকে বাড়াইয়া দিল।

দেখিলাম, শ্রীআশুতোষ মিত্রের দস্তখৎ-সম্বলিত একখানি হাজার টাকার চেক্।

সীমন্ত-হীরা

কিছুদিন যাবৎ ব্যোমকেশের হাতে কোনও কাজকর্ম্ম ছিল না।

এদেশের লোকের কেমন বদ্ অভ্যাস, ছোটখাট চুরি-চামারি হইলে বেবাক হজম করিয়া যায়, পুলিসে পর্য্যন্ত খবর দেয় না। হয় ত তাহারা ভাবে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল! নেহাৎ যখন গুরুতর কিছু ঘটিয়া যায় তখন সংবাদটা পুলিস পর্য্যন্ত পৌঁছায় বটে কিন্তু গাঁটের কড়ি খরচ করিয়া বেসরকারি গোয়েন্দা নিযুক্ত করিবার মত উদ্যোগ বা আগ্রহ কাহারও দেখা যায় না। কিছু দিন হা-হুতাশ ও পুলিসকে গালিগালাজ করিয়া অবশেষে তাহারা ক্ষান্ত হয়।

খুন জখম ইত্যাদিও যে আমাদের দেশে হয় না, এমন নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে বুদ্ধি বা চতুরতার লক্ষণ লেশমাত্র দেখা যায় না; রাগের মাথায় খুন করিয়া হত্যাকারী তৎক্ষণাৎ ধরা পড়িয়া যায় এবং সরকারের পুলিস তাহাকে হাজত-জাত করিয়া অচিরাৎ ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেয়।

সুতরাং সত্যান্বেষী ব্যোমকেশের পক্ষে সত্য অন্বেষণের সুযোগ যে বিরল হইয়া পড়িবে, ইহা বিচিত্র নহে। ব্যোমকেশের অবশ্য সে দিকে লক্ষ্যই ছিল না, সে সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে শেষ পৃষ্ঠার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ পর্য্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পড়িয়া বাকী সময়টুকু নিজের লাইব্রেরী ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া কাটাইয়া দিতেছিল। আমার কিন্তু এই একটানা অবকাশ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। যদিচ অপরাধীর অনুসন্ধান করা আমার কাজ নহে, গল্প লিখিয়া বাঙালী পাঠকের চিত্তবিনোদনরূপ অবৈতনিক কার্য্যকেই জীবনের ব্রত করিয়াছি, তবু চোর-ধরার যে একটা অপূর্ব্ব মাদকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার

উপায় নাই। নেশার বস্তুর মত এই উত্তেজনার উপাদান যথাসময় উপস্থিত না হইলে মন একবারে বিকল হইয়া যায় এবং জীবনটাই লবণহীন ব্যঞ্জনের মত বিস্বাদ ঠেকে।

তাই সে দিন সকালবেলা চা-পান করিতে করিতে ব্যোমকেশকে বলিলাম,—"কি হে, বাংলাদেশের চোর-ছ্যাঁচড়গুলো কি সব সাধু সন্ন্যাসী হয়ে গেল না কি ?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"না! তার প্রমাণ ত খবরের কাগজে রোজ পাচ্ছ।"

"তা ত পাচ্ছি। কিন্তু আমাদের কাছে আসচে কৈ ?"

"আসবে। চারে যখন মাছ আসবার তখনি আসে, তাকে জোর ক'রে ধ'রে আনা যায় না। তুমি কিছু অধীর হয়ে পড়েছ দেখছি। ধৈর্য্যং রহু। আসল কথা আমাদের দেশে প্রতিভাবান্ বদ্‌মায়েস—প্যারাডক্স হয়ে যাচ্ছে, কি করব; দোষ আমার নয়, দোষ তোমাদের দীনাহীনা পিঁচুটী-নয়না বঙ্গভাষার—প্রতিভাবান্ বদমায়েস খুব অল্পই আছে। পুলিস কোর্টের রিপোর্টে যাদের নাম দেখতে পাও, তারা চুনোপুঁটি। যাঁরা গভীর জলের মাছ—তাঁরা কদাচিৎ চারে এসে ঘাই মারেন। আমি তাঁদেরই খেলিয়ে তুলতে চাই। জানো ত যে পুকুরে দু'চারটে বড় বড় রুই কাৎলা আছে সেই পুকুরে ছিপ ফেলেই শিকারীর আনন্দ।"

আমি বলিলাম,—"তোমার উপমাগুলো থেকে বেজায় আঁসটে গন্ধ বেরুচ্ছে। মনস্তত্ত্ববিৎ যদি কেউ এখানে থাকতেন, তিনি নির্ভয়ে ব'লে দিতেন যে তুমি সত্যান্বেষণ ছেড়ে শীঘ্রই মাছের ব্যবসা আরম্ভ করবে।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তা হ'লে মনস্তত্ত্ববিৎ মহাশয় নিদারুণ ভুল করতেন। যে লোক মাছের সম্বন্ধে গভীর গবেষণা করে, সে জলচর জীবের কখনো নাম শোনে নি—এই হচ্ছে আজকালকার নূতন বিধি।

তোমার আধুনিক গল্প-লেখকদের দল এই কথাটাই আজকাল প্রমাণ করছে।"

আমি ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলাম,—"ভাই! আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই, প্রতিদানের আশা না করে শুধু আনন্দ যোগাই, তবু কি তোমাদের মন ওঠে না? এর বেশী যদি চাও তা হলে নগদ কিছু ছাড়তে হবে।"

দরজার কড়া নাড়িয়া "চিঠি হ্যায়" বলিয়া ডাক-পিয়ন প্রবেশ করিল। আমাদের জীবনে ডাক-পিওনের সমাগম এতই অপ্রচুর যে, মুহূর্ত্তমধ্যে সাহিত্যিক জীবনের দুঃখদীনতা ভুলিয়া গেলাম। গলা বাড়াইয়া দেখিলাম একখানা ইন্সিওর করা খাম ব্যোমকেশের নামে আসিয়াছে।

খাম ছিঁড়িয়া ব্যোমকেশ যখন চিঠি বাহির করিল, তখন কৌতূহল আরও বাড়িয়া গেল। ব্রঞ্জ-ব্লু কালিতে ছাপা মনোগ্রাম-যুক্ত পুরু কাগজে লেখা চিঠি এবং সেই সঙ্গে পিন্ দিয়া আঁটা একটি একশ' টাকার নোট। চিঠিখানি ছোট, ব্যোমকেশ পড়িয়া সহাস্যমুখে আমার হাতে দিয়া বলিল, —"এই নাও। গুরুতর ব্যাপার। উত্তর-বঙ্গের বনিয়াদি জমীদার-গৃহে রোমাঞ্চকর রহস্যের আবির্ভাব। সেই রহস্য উদ্‌ঘাটিত করবার জন্য জোর তাগদা এসেছে—পত্রপাঠ যাওয়া চাই। এমন কি, একশ' টাকা অগ্রিম রাহাখরচ পর্য্যন্ত এসে হাজির।"

চিঠি শিরোনামায় কোনও এক বিখ্যাত জমীদারী ষ্টেটের নাম। জমীদার স্বয়ং চিঠি লেখেন নাই, তাঁহার সেক্রেটারী ইংরাজীতে টাইপ করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই,—

প্রিয় মহাশয়!

কুমার শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয় কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি আপনার নাম শুনিয়াছেন। একটি

বিশেষ জরুরী কার্য্যে তিনি আপনার সাহায্য ও পরামর্শ লইতে ইচ্ছা করেন। অতএব আপনি অবিলম্বে এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে বাধিত হইব। পথখরচের জন্য ১০০৲ টাকার নোট এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

আপনি কোন্ ট্রেনে আসিতেছেন, তার-যোগে জানাইলে ষ্টেশনে গাড়ী উপস্থিত থাকিবে।

ইতি—

পত্র হইতে আর কোনও তথ্য সংগ্রহ করা গেল না। পত্র ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম,—"তাই ত হে, ব্যাপার সত্যই গুরুতর ঠেকছে। জরুরী কার্য্যটি কি—চিঠির কাগজ বা ছাপার হরফ থেকে কিছু অনুমান করতে পারলে? তোমার ত ও সব বিদ্যে আছে।"

"কিছু না। তবে আমাদের দেশের জমীদার বাবুদের যতদূর জানি, খুব সম্ভব কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ বাহাদুর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন যে, তাঁর পোষা হাতীটি পাশের জমীদার চুরি ক'রে নিয়ে গেছে; তাই শঙ্কিত হয়ে তিনি গোয়েন্দা তলব করেছেন।"

"না না, অতটা নয়। দেখছ না একেবারে গোড়াতেই এতগুলো টাকা খরচ ক'রে ফেলেছে। ভেতরে নিশ্চয় কোনো বড়রকম গোলমাল আছে।"

"ঐটি তোমাদের ভুল; বড় লোক রুগী হ'লে মনে কর ব্যাধিও বড় রকম হবে। দেখা যায় কিন্তু ঠিক তার উল্টো। বড়লোকের ফুস্কুড়ি হ'লে ডাক্তার আসে, কিন্তু গরীবের একেবারে নাভিশ্বাস না উঠ্‌লে ডাক্তার-বৈদ্যের কথা মনেই পড়ে না।"

"যা হোক, কি ঠিক করলে? যাবে না কি?"

ব্যোমকেশ একটু ভাবিয়া বলিল,—"হাতে যখন কোনো কাজ নেই,

তখন চল দু'দিনের জন্যে ঘুরেই আসা যাক। আর কিছু না হোক, নূতন দেশ দেখা ত হবে। তুমিও বোধ হয় ও-অঞ্চলে কখনো যাও নি।"

যদিচ যাইবার ইচ্ছা ষোল আনা ছিল তবু ক্ষীণভাবে আপত্তি করিলাম,—"আমার যাওয়াটা কি ঠিক হবে? তোমাকে ডেকেছে—"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"দোষ কি? এক জনের বদলে দু'জন গেলে কুমার বাহাদুর বরঞ্চ খুসীই হবেন। ধনক্ষয় যখন অন্যের হচ্ছে, তখন যাওয়াটা ত একটা কর্ত্তব্যবিশেষ। শাস্ত্রে লিখেছে—সর্ব্বদা পরের পয়সায় তীর্থ-দর্শন করবে।"

কোন শাস্ত্রে এমন জ্ঞানগর্ভ নীতি উপদেশ আছে যদিও স্মরণ করিতে পারিলাম না, তবু সহজেই রাজি হইয়া গেলাম।

সেই দিন সন্ধ্যার গাড়ীতে যাত্রা করিলাম। পথে উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটিল না, শুধু একটী অত্যন্ত মিশুক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হইল। সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় আমরা তিন জন ছাড়া আর কেহ ছিল না, একথা সেকথার পর ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মশাইদের কদ্দূর যাওয়া হচ্ছে?"

প্রত্যুত্তরে ব্যোমকেশ মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মশাইয়ের কদ্দূর যাওয়া হবে?"

পাল্টা প্রশ্নে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হইয়া থাকিয়া ভদ্রলোকটী আমতা-আমতা করিয়া বলিলেন,—"আমি—এই পরের ষ্টেশনেই নামব।"

ব্যোমকেশ পূর্ব্ববৎ মধুর স্বরে বলিল,—"আমরাও তার পরের ষ্টেশনে নেমে যাব।"

অহেতুক মিথ্যা বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ব্যোমকেশের কোনও মতলব আছে বুঝিয়া আমি কিছু বলিলাম না। গাড়ী থামিতেই ভদ্রলোক নামিয়া গেলেন। রাত্রি হইয়াছিল, প্ল্যাটফর্ম্মের ভিড়ে তিনি নিমেষমধ্যে কোথায় মিলাইয়া গেলেন, তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না।

দুই তিন ষ্টেশন পরে জানালার কাচ নামাইয়া বাহিরে গলা বাড়াইয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম, পাশের একটা ইণ্টার ক্লাশের কামরার জানলায় মাথা বাহির করিয়া ভদ্রলোকটি আমাদের গাড়ীর দিকেই তাকাইয়া আছেন। চোখোচোখি হইবামাত্র তিনি বিদ্যুদ্‌বেগে মাথা টানিয়া লইলেন। আমি উত্তেজিতভাবে ব্যোমকেশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম,—"ওহে—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"জানি। ভদ্রলোক পাশের গাড়ীতে উঠেছেন। ব্যাপার যতটা তুচ্ছ মনে করেছিলুম, দেখছি তা নয়। ভালই!"

তারপর প্রায় প্রতি ষ্টেশনেই জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিয়াছি, কিন্তু সে ভদ্রলোকের চুলের টিকি পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই।

পরদিন ভোর হইতে না হইতে গন্তব্যস্থানে পৌছিলাম। ষ্টেশনটী ছোট, সেখান হইতে প্রায় ছয় সাত মাইল মোটরে যাইতে হইবে। একখানি দামী মোটর লইয়া জমীদারের একজন কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। আমরা মোটরে বসিলাম। অতঃপর নির্জ্জন পথ দিয়া মোটর নিঃশব্দে ছুটিয়া চলিল।

কর্ম্মচারিটি প্রবীণ এবং বিচক্ষণ; ব্যোমকেশ কৌশলে তাঁহাকে দু' একটি প্রশ্ন করিতেই তিনি বলিলেন,—"আমি কিছুই জানি না মশাই! শুধু আপনাদের ষ্টেশন থেকে নিয়ে যাওয়ার হুকুম পেয়েছিলাম, তাই যাচ্ছি।"

আমরা মুখ তাকাতাকি করিলাম, আর কোনো কথা হইল না। পরে জমীদার ভবনে পৌছিয়া দেখিলাম,—সে এক এলাহি কাণ্ড! মাঠের মাঝখানে যেন ইন্দ্রপুরী বসিয়াছে। প্রকাণ্ড সাবেক পাঁচমহাল ইমারৎ তাহাকে ঘিরিয়া প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বিঘা জমীর উপর বাগান, হট হাউস্, পুষ্করিণী, টেনিস্ কোর্ট, কাছারি বাড়ী, অতিথিশালা, পোষ্ট-আফিস্—আরও কত কি। চারিদিকে লস্কর পেয়াদা গোমস্তা সরকার খাতক প্রজার ভিড় লাগিয়া গিয়াছে। আমাদের মোটর বাড়ীর সম্মুখে থামিতেই

জমীদারের প্রাইভেট সেক্রেটারী স্বয়ং আসিয়া আমাদের সমাদর করিয়া ভিতরে লইয়া গেলেন। একটা আস্ত মহল আমাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেক্রেটারী বলিলেন,—"আপনারা মুখহাত ধুয়ে একটু জলযোগ ক'রে নিন্। ততক্ষণে কুমার বাহাদুরও আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তৈরী হয়ে যাবেন।"

স্নানাদি সারিয়া বাহির হইতেই প্রচুর প্রাতরাশ আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার যথারীতি ধ্বংস-সাধন করিয়া তৃপ্তমনে ধূমপান করিতেছি, এমন সময় সেক্রেটারী আসিয়া বলিলেন,—"কুমার বাহাদুর লাইব্রেরী-ঘরে আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। যদি আপনাদের অবসর হয়ে থাকে —আমার সঙ্গে আসুন।"

আমরা উঠিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। রাজসকাশে যাইতেছি, এম্‌নি একটা ভাব লইয়া লাইব্রেরী-ঘরে প্রবেশ করিলাম। 'কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ' নাম হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিষয়ে বিরাট আড়ম্বর দেখিয়া মনের মধ্যে কুমার বাহাদুর সম্বন্ধে একটা গুরুগম্ভীর ধারণা জন্মিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। দেখিলাম, আমাদেরই মত সাধারণ পাঞ্জাবী পরা একটি সহাস্যমুখ যুবা-পুরুষ, গৌরবর্ণ সুশ্রী চেহারা—ব্যবহারে তিলমাত্র আড়ম্বর নাই। আমরা যাইতেই চেয়ার হইতে উঠিয়া আগেই হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। পলকের জন্য একটু দ্বিধা করিয়া ব্যোমকেশকে বলিলেন,—"আপনিই ব্যোমকেশ বাবু? আসুন।"

ব্যোমকেশ আমাকে পরিচিত করিয়া দিয়া বলিল,—"ইনি আমার বন্ধু সহকারী এবং ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক। তাই ওকে সহজে কাছ-ছাড়া করি নে।"

কুমার ত্রিদিব হাসিয়া কহিলেন,—"আশা করি, আপনার জীবনী লেখার প্রয়োজন এখনও অনেক দূরে। অজিত বাবু এসেছেন, আমি

ভারি খুসি হয়েছি। কারণ, প্রধানতঃ ওর লেখার ভিতর দিয়েই আপনার নামের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।"

উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অন্যের মুখে নিজের লেখার অযাচিত উল্লেখ যে কত মধুর, তাহা যিনি ছাপার অক্ষরের কারবার করেন, তিনিই জানেন। বুঝিলাম, ধনী জমীদার হইলেও লোকটি অতিশয় সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্। লাইব্রেরী-ঘরের চারিদিকে চক্ষু ফিরাইয়া দেখিলাম, দেয়াল-সংলগ্ন আল্‌মারিগুলি দেশী বিলাতী নানা প্রকার পুস্তকে ঠাসা। টেবলের উপরেও অনেকগুলি বই ইতস্ততঃ ছড়ানো রহিয়াছে। লাইব্রেরী ঘরটি যে কেবলমাত্র জমীদার-গৃহের শোভাবর্দ্ধনের জন্য নহে, রীতিমত ব্যবহারের জন্য—তাহাতে সন্দেহ রহিল না।

আরও কিছুক্ষণ শিষ্টতা-বিনিময়ের পর কুমার বাহাদুর বলিলেন,—"এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।" সেক্রেটারীকে হুকুম দিলেন, "তুমি এখন যেতে পার। লক্ষ্য রেখো, এ ঘরে যেন কেউ না ঢোকে।"

সেক্রেটারী সন্তর্পণে দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিলে কুমার ত্রিদিব চেয়ারে ঝুঁকিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আপনাদের যে কাজের জন্য এত কষ্ট দিয়ে ডেকে আনিয়েছি, সে কাজ যেমন গুরুতর, তেমনি গোপনীয়। তাই সকল কথা প্রকাশ ক'রে বলবার আগে আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, এ কথা ঘুণাক্ষরেও তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হবে না। এত সাবধানতার কারণ, এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাদের বংশের মর্য্যাদা জড়ানো রয়েছে।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"প্রতিশ্রুতি দেবার কোন দরকার আছে মনে করি নে, একজন মক্কেলের গুপ্তকথা অন্য লোককে বলা আমাদের রীতি নয়। কিন্তু আপনি যখন প্রতিশ্রুতি চান, তখন দিতে কোনো বাধাও নেই। কি ভাবে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে বলুন।"

কুমার হাসিয়া বলিলেন,—"তামা-তুলসীর দরকার নেই। আপনাদের মুখের কথাই যথেষ্ট।"

আমি একটু দ্বিধায় পড়িলাম, বলিলাম,—"গল্পচ্ছলেও কি কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না?"

কুমার দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন,—"না। এ সম্বন্ধে কোনো আলোচনাই চলবে না।"

হয় ত একটা ভাল গল্পের মাল মশলা হাত-ছাড়া হইয়া গেল, এই ভাবিয়া মনে মনে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,— "আপনি নির্ভয়ে বলুন। আমরা কোনো কথা প্রকাশ করব না।"

কুমার ত্রিদিব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, যেন কি ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবেন তাহাই ভাবিয়া লইলেন। তারপর বলিলেন,—"আমাদের বংশে যে-সব সাবেক কালের হীরা-জহরৎ আছে, সে সম্বন্ধে বোধ হয় আপনি কিছু জানেন না—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"কিছু কিছু জানি। আপনাদের বংশে একটি হীরা আছে, যার তুল্য হীরা বাংলা দেশে আর দ্বিতীয় নেই—তার নাম সীমন্ত-হীরা।"

ত্রিদিব সাগ্রহে বলিলেন,—"আপনি জানেন? তা হ'লে এ কথাও জানেন বোধ হয় যে, গতমাসে কলকাতায় যে রত্ন-প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে ঐ হীরা দেখানো হয়েছিল?"

ব্যোমকেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"জানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে হীরা চোখে দেখার সুযোগ হয় নি।"

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কুমার কহিলেন,—"সে সুযোগ আর কখনো হবে কি না জানি না। হীরাটা চুরি গেছে।"

ব্যোমকেশ প্রতিধ্বনি করিয়া কহিল,—"চুরি গেছে!"

শান্তকণ্ঠে কুমার বলিলেন,—"হ্যাঁ, সেই সম্পর্কেই আপনাকে আনিয়েছি। ঘটনাটা সুরু থেকে বলি শুনুন। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমাদের এই জমীদার বংশ অতি প্রাচীন কাল থেকে চ'লে আসছে।

বারো ভুঁইয়ারও আগে পাঠান বাদশা'দের আমলে আমাদের আদি পূর্ব্বপুরুষ এই জমীদারী অর্জ্জন করেন। শাদা কথায় তিনি একজন দুর্দ্দান্ত ডাকাতের সর্দ্দার ছিলেন, নিজের বাহুবলে সম্পত্তি লাভ ক'রে পরে বাদশা'র কাছ থেকে সনন্দ আদায় করেন। সে বাদশাহী সনন্দ এখনো আমাদের কাছে বর্ত্তমান আছে। এখন আমাদের অনেক অধঃপতন হয়েছে; চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে আমাদের রাজা উপাধি ছিল।

"ঐ 'সীমন্ত-হীরা' আমাদের আদি পূর্ব্বপুরুষের সময় থেকে পুরুষানুক্রমে এই বংশে চ'লে আসছে। একটা প্রবাদ আছে যে, এই হীরা যতদিন আমাদের কাছে থাকবে, ততদিন বংশের কোনো অনিষ্ট হবে না; কিন্তু হীরা কোনও রকমে হস্তান্তরিত হলেই এক পুরুষের মধ্যে বংশ লোপ হয়ে যাবে।"

একটু থামিয়া কুমার আবার বলিতে লাগিলেন,—"জমীদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র জমীদারীর উত্তরাধিকারী হয়,—এই হচ্চে আমাদের বংশের চিরাচরিত লোকাচার। কনিষ্ঠরা কেবল বাবুয়ান্ বা ভরণপোষণ পান। এই সূত্রে দু'বছর আগের আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি জমিদারী পেয়েছি। আমি বাপের একমাত্র সন্তান, উপস্থিত আমার এক কাকা আছেন, তিনি বাবুয়ান্স্বরূপ তিন হাজার টাকা মাসিক খোরপোষ জমীদারী থেকে পেয়ে থাকেন।

"এই ত গেল গল্পের ভূমিকা। এবার হীরা চুরির ঘটনাটা বলি। রত্ন-প্রদর্শনীতে আমার হীরা একৃজিবিট্ করবার নিমন্ত্রণ যখন এল, তখন আমি নিজে স্পেশাল ট্রেণে ক'রে সেই হীরা নিয়ে কলকাতা গেলাম; কলকাতায় পৌঁছে হীরাখানা প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষের কাছে জমা ক'রে দেবার পর তবে নিশ্চিন্ত হলাম। আপনারা জানেন, প্রদর্শনীতে বরোদা, হায়দ্রাবাদ, পাতিয়ালা প্রভৃতি রাজবংশের খানদানি জহরৎ প্রদর্শিত

হয়েছিল। প্রদর্শনের কর্তা ছিলেন স্বয়ং গভর্ণমেণ্ট, সুতরাং সেখান থেকে হীরা চুরি যাবার কোনো ভয় ছিল না। তা ছাড়া যে গ্লাসকেসে আমার হীরা রাখা হয়েছিল, তার চাবি কেবল আমারই কাছে ছিল।

"সাত দিন ধরে এক্‌জিবিশন্‌ চল্‌ল। আট দিনের দিন আমার হীরা নিয়ে আমি বাড়ী ফিরে এলাম। বাড়ী ফিরে এসে জানতে পারলাম যে, আমার হীরা চুরি গেছে, তার বদলে যা ফিরিয়ে এনেছি, তা দু'শো টাকা দামের মেকি পেষ্ট।"

কুমার চুপ করিলেন। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"চুরি ধরা পড়বার পর প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষকে কিম্বা পুলিসকে খবর দেন নি কেন?"

কুমার বলিলেন,—খবর দিয়ে কোনও লাভ হ'ত না, কারণ, কে চুরি করেছে, চুরি ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা জানতে পেরেছিলাম!"

"ওঃ"—ব্যোমকেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল কুমারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—তারপর ব'লে যান।"

কুমার বলিতে লাগিলেন,—"এ কথা কাউকে বলবার নয়। পাছে জানাজানি হয়ে পারিবারিক কলঙ্ক বার হয়ে পড়ে, খবরের কাগজে এই নিয়ে লেখালেখি সুরু হয়ে যায়, এই ভয়ে বাড়ীর লোককে পর্য্যন্ত এ কথা জানাতে পারি নি। জানি শুধু আমি আর আমার বৃদ্ধ দেওয়ান মহাশয়!"

কথাটা আরও খোলসা ক'রে বলা দরকার। পূর্ব্বে বলেছি, আমার এক কাকা আছেন। তিনি কলকাতায় থাকেন, ষ্টেট থেকে মাসিক তিন হাজার টাকা খরচা পান। তাঁর নাম আপনারা নিশ্চয় শুনেছেন,—তিনিই বিখ্যাত শিল্পী এবং বৈজ্ঞানিক স্যার দিগিন্দ্রনারায়ণ রায়। তাঁর মত আশ্চর্য্য মানুষ খুব কম দেখা যায়। বিলেতে জন্মালে তিনি বোধ হয় অদ্বিতীয় মনীষী ব'লে পরিচিত হ'তে পারতেন। যেমন

তাঁর অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, তেমনই অগাধ পাণ্ডিত্য। গত মহাযুদ্ধের সময় তিনি প্ল্যাষ্টার অফ প্যারিস্ সম্বন্ধে কি একটা নূতন তথ্য আবিষ্কার ক'রে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টকে উপহার দিয়েছিলেন—তার ফলে 'স্যর' উপাধি পান। শিল্পের দিকেও তাঁর কি অসামান্য প্রতিভা, তার পরিচয় সম্ভবত আপনাদের অল্পবিস্তর জানা আছে। প্যারিসের শিল্প-প্রদর্শনীতে মহাদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি একজিবিট ক'রে তিনি যে সম্মান ও প্রশংসা লাভ করেন, তা কারুর অবিদিত নেই। মোটের উপর এমন বহুমুখী প্রতিভা সচরাচর চোখে পড়ে না।" বলিয়া কুমার বাহাদুর একটু হাসিলেন।

আমরা নড়িয়া চড়িয়া বসিলাম। কুমার বলিতে লাগিলেন,—"কাকা আমাকে কম স্নেহ করেন না, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছিল। ঐ হীরাটা তিনি আমার কাছে চেয়েছিলেন। হীরাটার উপর তাঁর একটা অহেতুক আসক্তি ছিল। তার দামের জন্ম নয়, শুধু হীরাটাকেই নিজের কাছে রাখবার জন্যে তিনি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"হীরাটার দাম কত হবে?"

কুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"খুব সম্ভব তিন পয়জার। টাকা দিয়ে সে জিনিস কেনবার মত লোক ভারতবর্ষে খুব কমই আছে। তা ছাড়া আমরা কখনও তার দাম যাচাই ক'রে দেখি নি। গৃহদেবতার মতই সে হীরা অমূল্য ছিল।"

"সে যাক্। আমার বাবার কাছেও কাকা ঐ হীরাটা চেয়েছিলেন, কিন্তু বাবা দেন নি। তারপর বাবা মারা যাবার পর কাকা আমার কাছে সেটা চাইলেন। বললেন,—আমার মাসহারা চাই না, তুমি শুধু আমায় হীরাটা দাও।' বাবা মৃত্যুকালে আমাকে এ বিষয়ে সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন, তাই যোড়হাত ক'রে কাকাকে বললাম,—'কাকা, আপনার

আর যা-ইচ্ছা নিন, কিন্তু ও হীরাটা দিতে পারব না। বাবার শেষ আদেশ।'—কাকা আর কিছু বললেন না, কিন্তু বুঝলাম, তিনি আমার উপর মর্ম্মান্তিক অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তার পর থেকে কাকার সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।"

"তবে পত্র ব্যবহার হয়েছে। যে দিন হীরা নিয়ে কলকাতা থেকে ফিরে এলাম, তার পরদিন কাকার কাছ থেকে এক চিঠি এল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু প'ড়ে মাথা ঘুরে গেল। এই দেখুন সে চিঠি।"

চাবি দিয়া সেক্রেটেরিয়েট টেবলের দেরাজ খুলিয়া কুমার বাহাদুর একখানা চিঠি বাহির করিয়া দিলেন। ছোট ছোট সুছাঁদ অক্ষরে লেখা বাঙলা চিঠি, তাহাতে লেখা আছে,—

কল্যাণীয় খোকা,

দুঃখিত হয়ো না। তোমরা দিতে চাও নি, তাই আমি নিজের হাতেই নিলাম।

বংশলোপ হবে ব'লে যে কুসংস্কার আছে, তাতে বিশ্বাস করো না। ওটা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের একটা ফন্দি মাত্র, যাতে জিনিসটা হস্তান্তরিত করতে কেউ সাহস না করে। আশীর্ব্বাদ নিও—

ইতি—

তোমার কাকা

শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ রায়

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চিঠি ফেরৎ দিল। কুমার বলিতে লাগিলেন,—"চিঠি পড়েই ছুটলাম তোষাখানায়। লোহার সিন্দুক খুলে হীরের বাক্স বার ক'রে দেখলাম, হীরা ঠিক আছে। দেওয়ান মশায়কে ডাকলাম, তিনি জহরতের এক জন ভাল জহুরী, দেখেই বল্লেন, জাল হীরা। কিন্তু

চেহারায় কোথাও এতটুকু তফাৎ নেই, একেবারে অবিকল আসল হীরার জোড়া।"

কুমার দেরাজ খুলিয়া একটি ভেলভেটের বাক্স বাহির করিলেন। ডালা খুলিতেই সুপারির মত গোলাকার একটা পাথর আলোকসম্পাতে ঝকমক করিয়া উঠিল। কুমার বাহাদুর দুই আঙুলে সেটা তুলিয়া ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিলেন,—"জহুরী ছাড়া কারুর সাধ্য নেই যে বোঝে এটা ঝুঁটো। আসলে দু'শো টাকার বেশী এর দাম নয়।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া আমরা সেই মূল্যহীন কাচখণ্ডটাকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিলাম; তার পর দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া ব্যোমকেশ সেটা ফিরাইয়া দিল, বলিল,—"তা হ'লে আমার কাজ হচ্ছে সেই আসল হীরাটা উদ্ধার করা?"

স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কুমার বলিলেন,—"হ্যাঁ। কেমন ক'রে হীরা চুরি গেল, সে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন দরকার নেই। আমি শুধু আমার হীরাটা ফেরৎ চাই! যেমন ক'রে হোক, যে উপায়ে হোক, আমার 'সীমন্ত-হীরা' আমাকে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে। খরচের জন্যে ভাবনা করবেন না, যত টাকা লাগে, যদি বিশ হাজার টাকা দরকার হয়, তাও দিতে আমি পশ্চাৎপদ হব না জানবেন। শুধু একটি সর্ত্ত, কোনও রকমে এ কথা যেন খবরের কাগজে না ওঠে।"

ব্যোমকেশ তাচ্ছীল্যভরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কবে নাগাদ হীরাটা পেলে আপনি খুসী হবেন?"

উত্তেজনায় কুমার বাহাদুরের মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—"কবে নাগাদ? তবে কি,—তবে কি আপনি হীরাটা উদ্ধার করতে পারবেন ব'লে মনে হয়?"

ব্যোমকেশ হাসিল, বলিল—"এ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। আমি এর চেয়ে ঢের বেশী জটিল রহস্য প্রত্যাশা করেছিলুম। যা হোক, আজ

শনিবার; আগামী শনিবারের মধ্যে আপনার হীরা ফেরৎ পাবেন।" বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

কলিকাতায় ফিরিয়া প্রথম দিনটা গোলেমালে কাটিয়া গেল।

রাত্রে দুই জনে কথা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"প্ল্যান্ অফ্ ক্যাম্পেন কিছু ঠিক করলে?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"না, আগে বাড়ীটা দেখে কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যাক, তার পর প্ল্যান স্থির করা যাবে।"

"হীরাটা কি বাড়ীতেই আছে মনে হয়?"

"নিশ্চয়। যে জিনিসের মোহে খুড়ো মহাশয় শেষ বয়সে ভাইপো'র সম্পত্তি চুরি করেছেন, সে জিনিস তিনি এক দণ্ডের জন্যও কাছ-ছাড়া করবেন না। আমাদের শুধু জানা দরকার, কোথায় তিনি সেটা রেখেছেন। আমার বিশ্বাস—"

"তোমার বিশ্বাস—?"

"যাক্, সেটা অনুমানমাত্র। দিগিন্দ্রনারায়ণ খুড়া মহাশয়ের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুই ঠিক ক'রে বলা যায় না।"

আমি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলাম,—"আচ্ছা ব্যোমকেশ, এ কাজের নৈতিক দিকটা ভেবে দেখেছ?"

"কোন্ কাজের?"

"যে উপায় অবলম্বন ক'রে তুমি হীরাটা উদ্ধার করতে যাচ্ছ।"

"ভেবে দেখছি। তাহা নিছক চুরি, ধরা পড়লে জেলে যেতে হবে। কিন্তু চুরি মাত্রেই নৈতিক অপরাধ নয়। চোরের উপর বাটপাড়ি করা মহা পুণ্যকার্য্য।"

"তা যেন বুঝলুম, কিন্তু দেশের আইন ত সে কথা শুনবে না।"

"সে ভাবনা আমার নয়। আইনের যাঁরা রক্ষক, তাঁরা পারেন আমাকে শাস্তি দিন।"

পরদিন দুপুরবেলা ব্যোমকেশ একাকী বাহির হইয়া গেল; যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাত-মুখ ধুইয়া জলযোগ করিতে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কাজ কত দূর হ'ল?

ব্যোমকেশ অন্যমনস্কভাবে কচুরিতে কামড় দিয়া বলিল,—"বিশেষ সুবিধা হ'ল না। বুড়ো একটি হর্ত্তেল ঘুঘু। আর তার একটি নেপালী চাকর আছে, সে বেটার চোখ দুটো ঠিক শিকারী বেরালের মত। যা হোক একটা সুরাহা হয়েছে, বুড়ো একজন সেক্রেটারী খুঁজছে—দুটো দরখাস্ত ক'রে দিয়ে এসেছি।"

"সব কথা খুলে বল।"

চায়ে চুমুক দিয়া বাটি নামাইয়া রাখিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"কুমার বাহাদুর যা বলেছিলেন, তা নেহাৎ মিথ্যে নয়,—খুড়ো মহাশয় অতি পাকা লোক। বাড়ীটা নানারকম বহুমূল্য জিনিসের একটা মিউজিয়াম বললেই হয়;—কর্ত্তা একলা থাকেন বটে, কিন্তু অনুগত এবং বিশ্বাসী লোকলস্করের অভাব নেই। প্রথমতঃ বাড়ীর কম্পাউণ্ডে ঢোকাই মুস্কিল,—ফটকে চারটে দরোয়ান অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ব'সে আছে, কেউ ঢুকতে গেলেই হাজার রকম প্রশ্ন। পাঁচীল ডিঙিয়ে যে ঢুকবে, তারও উপায় নেই—আট হাত উঁচু পাঁচীল, তার উপর ছুঁচালো লোহার শিক বসানো। যা হোক, কোনও রকমে দরোয়ান বাবুদের খুশী ক'রে ফটকের ভিতর যদি ঢুকলে, বাড়ীর সদর-দরজায় নেপালী ভৃত্য উজরে সিং থাপা বাঘের মত থাবা গেড়ে ব'সে আছেন,—ভালোরকম কৈফিয়ৎ যদি না দিতে পার, বাড়ীতে ঢোকবার আশা ঐখানেই ইতি। রাত্রির ব্যবস্থা আরও চমৎকার। দরোয়ান, চৌকিদার ত আছেই, তার উপর চারটে বিলিতী ম্যাষ্টিফ

কুকুর কম্পাউণ্ডের মধ্যে ছাড়া থাকে। সুতরাং নিশীথসময়ে নিরিবিলি গিয়ে যে কার্য্যোদ্ধার করবে, সে পথও বন্ধ।”

“তবে উপায় ?”

“উপায় হয়েছে। বুড়োর এক জন সেক্রেটারী চাই—বিজ্ঞাপন দিয়েছে। দেড়শ’ টাকা মাইনে—বাড়ীতেই থাকতে হবে। বিজ্ঞান-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা চাই এবং শর্টহাণ্ড টাইপিং ইত্যাদি আরও অনেক রকম সদ্‌গুণের আবশ্যক। তাই দুটো দরখাস্ত ক’রে দিয়ে এসেছি,—কাল ইণ্টারভিউ করতে যেতে হবে।”

“দু’টো দরখাস্ত কেন ?”

“একটা তোমার, একটা আমার। যদি একটা ফস্কায়, অন্যটা লেগে যাবে।”

পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকালবেলা আটটার সময় আমরা স্যর দিগিন্দ্রনারায়ণের ভবনে সেক্রেটারী পদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলাম। সহরের দক্ষিণে অভিজাত-পল্লীতে তাঁহার বাড়ী ; দরোয়ানের ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম, আমাদের মত আরও কয়েক জন চাকরী অভিলাষী হাজির আছেন। একটা ঘরের মধ্যে সকলে গিয়া বসিলাম এবং বক্রকটাক্ষে পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম। ব্যোমকেশ ও আমি যে পরস্পরকে চিনি, তাহার আভাসমাত্র দিলাম না। পূর্ব্ব হইতেই সেইরূপ স্থির করিয়া গিয়াছিলাম।

বাড়ীর কর্ত্তা ভিতরের কোনও একটা ঘরে বসিয়া একে একে উমেদার-দিগকে ডাকিতেছিলেন। মনের মধ্যে উৎকণ্ঠা জাগিতেছিল, হয় ত আমাদের ডাক পড়িবার পূর্ব্বেই অন্য কেহ বাহাল হইয়া যাইবে ; কিন্তু দেখা গেল, একে একে সকলেই ফিরিয়া আসিলেন এবং বাঙ্ নিষ্পত্তি না করিয়া শুষ্ক-মুখে প্রস্থান করিলেন। শেষ পর্য্যন্ত বাকি রহিয়া গেলাম আমি আর ব্যোমকেশ।

বলা বাহুল্য ব্যোমকেশ নাম ভাঁড়াইয়া দরখাস্ত করিয়াছিল; আমার নূতন নামকরণ হইয়াছিল জিতেন্দ্রনাথ এবং ব্যোমকেশের নিখিলেশ। পাছে ভুলিয়া যাই, তাই নিজের নামটা মাঝে মাঝে আবৃত্তি করিয়া লইতেছিলাম, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, কর্ত্তা আমাদের দুই জনকে একসঙ্গে তলব করিয়াছেন। কিছু বিস্মিত হইলাম। ব্যাপার কি? এতক্ষণ ত একে একে ডাক পড়িতেছিল, এখন আবার একসঙ্গে কেন? যাহা হোক, বিনা বাক্যব্যয়ে ভৃত্যের অনুসরণ করিয়া গৃহস্বামীর সম্মুখীন হইলাম।

প্রায় আসবাবশূন্য প্রকাণ্ড একখানা ঘরের মাঝখানে বৃহৎ সেক্রেটেরিয়েট টেবিল এবং তাহারই সম্মুখে দরজার দিকে মুখ করিয়া হাতকাটা পিরাণ-পরিহিত বিশালকায় স্যর দিগিন্দ্র বসিয়া আছেন। বুল্‌ডগের মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি-গোঁফ গজাইলে যে রকম দেখিতে হয়, সে রকম একখানা মুখ—হঠাৎ দেখিলে 'বাপ রে' বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিতে ইচ্ছা হয়। হাঁড়ির মত মাথা, তাহার মধ্যস্থলে টাক পড়িয়া খানিকটা স্থান চক্‌চকে হইয়া গিয়াছে। প্রকাণ্ড শরীর এবং প্রকাণ্ড মস্তকের মাঝখানে গ্রীবা বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। দীর্ঘ রোমশ দুটা বাহু বনমানুষের মত দৃঢ় এবং ভয়ঙ্কর; কিন্তু তাহার প্রান্তে আঙুলগুলি 'ভারতীয় চিত্রকলা'র মত সরু ও সুদৃশ্য,—একবারে লতাইয়া না গেলেও পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ বাঁকিয়া গিয়াছে। চক্ষু দু'টা ক্ষুদ্র এবং সর্ব্বদাই যেন লড়াই করিবার জন্য প্রতিদ্বন্দী খুঁজিতেছে। মোটের উপর, আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত এই লোকটিকে দেখিবামাত্র একটা অহেতুক সম্ভ্রম ও ভীতির সঞ্চার হয়, মনে হয়, ইহার ঐ কুদর্শন দেহটার মধ্যে ভাল ও মন্দ করিবার অফুরন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে।

আমরা বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া টেবলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলাম। সেই ক্ষুদ্র চক্ষু দুটি আমার মুখ হইতে ব্যোমকেশের মুখে

দ্রুতবেগে কয়েকবার যাতায়াত করিয়া ব্যোমকেশের মুখের উপর স্থির হইল। তারপর সেই প্রকাণ্ড মুখে এক অদ্ভুত হাসি দেখা দিল। বুলডগ হাসিতে পারে কি না জানি না; কিন্তু পারিলে বোধ করি ঐ রকমই হাসিত। এই হাস্য ক্রমে মিলাইয়া গেলে জলদগম্ভীর শব্দ হইল,—"উজ্‌রে, দরজা বন্ধ ক'রে দাও।"

নেপালী ভৃত্য উজ্‌রে সিং দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়াছিল, নিঃশব্দে বাহির হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। কর্তা তখন টেবলের উপর হইতে আমাদের দরখাস্ত দুইটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন,—"কার নাম নিখিলেশ ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে আমার।"

কর্তা কহিলেন,—"হুঁ। তুমি নিখিলেশ। আর তুমি জিতেন্দ্রনাথ? তোমরা দুজনে শল্লা ক'রে দরখাস্ত করেছ ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে, আমি ওঁকে চিনি না।"

কর্তা কহিলেন,—"বটে! চেনো না? কিন্তু দরখাস্ত প'ড়ে আমার অন্য রকম মনে হয়েছিল। যা হোক্, তুমি এম্.এস্-সি পাশ করেছ ?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

"কোন্ য়ুনিভার্সিটি থেকে ?"

"ক্যালকাটা য়ুনিভার্সিটি থেকে।"

"হুঁ।" টেবলের উপর হইতে একখানা মোটা বই তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা খুলিয়া কহিলেন,—"কোন্ সালে পাশ করেছ ?"

সভয়ে দেখিলাম, বইখানা য়ুনিভার্সিটি কর্তৃক মুদ্রিত পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের তালিকা। আমার কপাল ঘামিয়া উঠিল। এই রে! এবার বুঝি সব ফাঁসিয়া যায়!

ব্যোমকেশ কিন্তু নিষ্কম্প স্বরে কহিল,—"আজ্ঞে, এই বছর। মাস-খানেক আগে রেজাল্ট বেরিয়েছে।"

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। যাক্, একটা ফাঁড়া ত কাটিল, এ বছরের নামের তালিকা এখনও ছাপিয়া বাহির হয় নাই।

কর্ত্তা ব্যর্থ হইয়া রাখিয়া দিলেন। তার পর আরও কিছুক্ষণ ব্যোমকেশের উপর কঠোর জেরা চলিল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে টলাইতে পারিলেন না। শর্টহ্যাণ্ড পরীক্ষাতেও যখন সে সহজে উত্তীর্ণ হইয়া গেল, তখন কর্ত্তা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,—"বেশ। তোমাকে দিয়ে আমার কাজ চলতে পারে। তুমি বসো।"

ব্যোমকেশ বসিল। কর্ত্তা কিয়ৎকাল ভ্রূকুটি করিয়া টেবলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তার পর হঠাৎ আমার পানে মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"অজিত বাবু!"

"আজ্ঞে।"

বোমা ফাটার মত হাসির শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, অদম্য হাসির তোড়ে কর্ত্তার বিশাল দেহ ফাটিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে। অকস্মাৎ এত আনন্দের কি কারণ ঘটিল, বুঝিতে না পারিয়া ব্যোমকেশের পানে তাকাইয়া দেখি, সে ভর্ৎসনাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া আছে তখন বুঝিতে পারিয়া লজ্জায় অনুশোচনায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। হায় হায়, মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় সব নষ্ট করিয়া ফেলিলাম!

কর্ত্তার হাসি সহজে থামিল না, কড়ি-বরগা কাঁপাইয়া প্রায় পাঁচ মিনিট ধরিয়া একাদিক্রমে চলিতে লাগিল। তার পর চক্ষু মুছিয়া আমার ম্রিয়মাণ মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া তিনি বলিলেন,—"লজ্জিত হয়ো না। আমার কাছে ধরা পড়া তোমাদের পক্ষে কিছুমাত্র লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বালক হয়ে তোমরা আমাকে ঠকাবে মনে করেছিলে, এতেই আমার ভারি আমোদ বোধ হচ্ছে।"

আমরা নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। কর্ত্তা ব্যোমকেশের মাথার দিকে

কিছুক্ষণ চক্ষু রাখিয়া বলিলেন,—"ব্যোমকেশ বাবু, তোমার কাছ থেকে আমি এতটা নির্ব্বুদ্ধিতা প্রত্যাশা করি নি। তুমি ছেলেমানুষ বটে, কিন্তু তোমার করোটির গঠন থেকে বুঝতে পারছি তোমার মাথায় বুদ্ধি আছে।" ব্যোমকেশের মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কতকটা নিজ মনেই বলিতে লাগিলেন,—"খুলির মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চান্ন আউন্স ব্রেন্-ম্যাটার আছে। তবে ব্রেন্-ম্যাটার থাকলেই শুধু হয় না, কন্‌ভল্যুশনের উপর সব নির্ভর করে।······হনু আর চোয়াল উঁচু, মৃদঙ্গমুখ, বাঁকা নাক, হুঁ। ত্বরিতকর্ম্মা, কুটবুদ্ধি, একগুঁয়ে। intuition খুব বেশী; reasoning power মন্দ developed নয় কিন্তু এখনো mature করে নি। তবে মোটের উপর বুদ্ধির বেশ শৃঙ্খলা আছে—বুদ্ধিমান্ বলা চলে।"

আমার মনে হইল, জীবন্ত ব্যোমকেশের শবব্যবচ্ছেদ হইতেছে, তাহার মস্তিষ্ককে কাটিয়া চিরিয়া ওজন করিয়া তাহার যথার্থ মূল্য নির্ণয় করা হইতেছে এবং আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতেছি।

স্বগত-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তা বলিলেন,—"আমার মাথায় কতখানি মস্তিষ্ক আছে জানো? ষাট্ আউন্স—তোমার চেয়ে পাঁচ আউন্স বেশী। অর্থাৎ বনমানুষে আর সাধারণ মানুষে বুদ্ধির যতখানি তফাৎ তোমার সঙ্গে আমার বুদ্ধির তফাৎ তার চেয়েও বেশী।"

ব্যোমকেশ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মুখে কোনও বিকার দেখা গেল না। কর্ত্তা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তার পর হঠাৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—"খোকা তোমাকে পাঠিয়েছে একটা জিনিস চুরি করবার জন্য। কিন্তু তুমি পারবে ব'লে মন হয়?"

এবারও ব্যোমকেশ কোনও উত্তর করিল না। তাহার নির্ব্বিকার নীরবতা লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা শ্লেষ করিয়া কহিলেন,—"কি হে ব্যোমকেশ

বাবু, একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে যে। বলি, এত বড় একটা কাজ হাতে নিয়েছ, পুরুৎ সেজে ঠাকুর চুরি করতে ঢুকেছ—তা, কি রকম মনে হচ্ছে? পারবে চুরি করতে?"

ব্যোমকেশ শান্তস্বরে কহিল,—"সাত দিনের মধ্যে কুমার বাহাদুরের জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দেব, কথা দিয়ে এসেছি।"

কর্ত্তার ভীষণ মুখ ভীষণতর আকার ধারণ করিল, ঘন রোমশ ভ্রূযুগল কপালের উপর যেন তাল পাকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"বটে, বটে! তোমার সাহস ত কম নয় দেখছি। কিন্তু কি ক'রে কাজ হাঁসিল করবে শুনি? এখনই ত তোমাদের ঘাড় ধ'রে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেব। তার পর?"

ব্যোমকেশ মৃদু হাসিয়া বলিল,—"আপনার কথা থেকে একটা সংবাদ পাওয়া গেল—হীরাটা বাড়ীতেই আছে।"

আরক্ত নেত্রে তাহার পানে চাহিয়া কর্ত্তা বলিলেন,—"হ্যাঁ, আছে। কিন্তু তুমি পারবে খুঁজে নিতে? তোমার ঘটে সে বুদ্ধি আছে কি?"

ব্যোমকেশ কেবল একটু হাসিল।

মনে হইল, এইবার বুঝি ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটিবে। কর্ত্তার কপালের শিরাগুলা ফুলিয়া উঁচু হইয়া উঠিল, দুই চক্ষে অন্ধ জিঘাংসা জ্বল্‌জ্বল্ করিতে লাগিল। হাতের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকিলে ব্যোমকেশের একটা রিষ্টি উপস্থিত হইত সন্দেহ নাই। ভাগ্যক্রমে সেরূপ কিছু ছিল না। তাই, সিংহ যেমন করিয়া কেশর নাড়া দেয়, তেমনি ভাবে মাথা নাড়িয়া কর্ত্তা কহিলেন,—"দেখ ব্যোমকেশ বাবু, তুমি মনে কর তোমার ভারি বুদ্ধি—না? তোমার মত ডিটেকটিব দুনিয়ায় আর নেই? তুমি বাংলাদেশের বার্ত্তিল˜? বেশ। তোমাকে তাড়াব না। এই বাড়ীর মধ্যে যাতায়াত করবার অবাধ অধিকার তোমায় দিলাম। যদি পার, খুঁজে বাঁর কর সে জিনিস। সাত দিনের মধ্যে ফিরিয়ে দেবে

কথা দিয়েছ না? তোমাকে সাত বছর সময় দিলাম, বার কর খুঁজে। And be damned!"

কর্ত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গর্জ্জন ছাড়িলেন,—"উজ্‌রে সিং!"

উজ্‌রে সিং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইল। কর্ত্তা আমাদের নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"এই বাবু দুটিকে চিনে রাখো। আমি বাড়ীতে থাকি বা না থাকি এঁরা এ বাড়ীতে যেখানে ইচ্ছে যেতে পারেন, বাধা দিও না। বুঝলে? যাও।"

উজ্‌রে সিং তাহার নির্ব্বিকার নেপালী মুখ ও তীর্য্যক্ চক্ষু আমাদের দিকে একবার ফিরাইয়া 'যো হুকুম' বলিয়া প্রস্থান করিল।

কর্ত্তা এবার রঘুবংশের কুম্ভোদর নামক সিংহের মত হাস্য করিলেন, বলিলেন,—"খুঁজি-খুঁজি নারি, যে পায় তারি—বুঝলে হে ব্যোমকেশ-চন্দ্র?"

"আজ্ঞে শুধু ব্যোমকেশ—চন্দ্র নেই।"

"না থাক। কিন্তু বুড়ো হয়ে ম'রে যাবে, তবু সে জিনিস পাবে না, বুঝলে? দিগন রায় যে-জিনিস লুকিয়ে রাখে, সে জিনিষ খুঁজে বার করা ব্যোমকেশ বক্সীর কর্ম্ম নয়।—ভাল কথা, আমার লোহার সিন্দুক ইত্যাদির চাবি যখন দরকার হবে, চেয়ে নিও। তাতে অবশ্য অনেক দামী জিনিস আছে, কিন্তু তোমার ওপর আমার অবিশ্বাস নেই। আমি এখন আমার ষ্টুডিওতে চললাম—আমাকে আজ আর বিরক্ত করো না।—আর একটা বিষয়ে তোমাদের সাবধান ক'রে দিই,—আমার বাড়ীময় অনেক বহুমূল্য ছবি আর প্ল্যাষ্টারের মূর্ত্তি ছড়ানো আছে, হীরা খোঁজার আগ্রহে সেগুলো যদি কোনও রকমে ভেঙে নষ্ট কর, তা হ'লে সেই দণ্ডেই কান ধ'রে বার ক'রে দেব। যে সুযোগ পেয়েছ, তাও হারাবে।"

এইরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণে পরিতুষ্ট করিয়া স্যর দিগিন্দ্র ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

দু'জনে মুখোমুখি কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম।

বুড়ার সহিত সংঘর্ষে ব্যোমকেশও ভিতরে ভিতরে বেশ কাবু হইয়াছিল, তাই ফ্যাকাশে গোছের একটু হাসিয়া বলিল,—"চল, বাসায় ফেরা যাক্। আজ আর কিছু হবে না।"

অন্যকে ঠকাইতে গিয়া নিজে ঠকিয়া অপদস্থ হওয়ার মত লজ্জা অল্পই আছে, তাই পরাজয় ও লাঞ্ছনার গ্লানি বহিয়া নীরবে বাসায় পৌঁছিলাম। দু'পেয়ালা করিয়া চা গলাধঃকরণ করিবার পর মন কতকটা চাঙ্গা হইলে বলিলাম,—"ব্যোমকেশ, আমার বোকামিতেই সব মাটী হ'ল।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"বোকামি অবশ্য তোমার হয়েছে, কিন্তু সে জন্য ক্ষতি কিছু হয় নি। বুড়ো আগে থাকতেই সব জানতো। মনে আছে—ট্রেণের সেই ভদ্রলোকটি? যিনি পরের ষ্টেশনে নেমে যাবেন ব'লে পাশের গাড়ীতে গিয়ে উঠেছিলেন? তিনি এরই গুপ্তচর। বুড়ো আমাদের নাড়ী-নক্ষত্র সব জানে।"

"খুব বাঁদর বানিয়ে ছেড়ে দিলে যা হোক। এমনটা আর কখনও হয় নি।"

ব্যোমকেশ চুপ করিয়া রহিল; তার পর বলিল,—"বুড়োর ঐ মারাত্মক দুর্ব্বলতাটুকু ছিল বলেই রক্ষে, নইলে হয় ত হাল ছেড়ে দিতে হ'ত।"

আমি সোজা হইয়া বসিয়া বলিলাম,—"কি রকম? তোমার কি এখনও আশা আছে না কি?"

"বিলক্ষণ! আশা আছে বৈ কি। তবে বুড়ো যদি সত্যিই ঘাড় ধ'রে বার ক'রে দিত, তা হ'লে কি হ'ত বলা যায় না। যা হো'ক, বুড়োর একটা দুর্ব্বলতার সন্ধান যখন পাওয়া গেছে, তখন ঐ থেকেই কার্য্যসিদ্ধি করতে হবে।"

"কোন্ দুর্ব্বলতার সন্ধান পেলে শুনি। আমি ত বাবা কোথাও এতটুকু ছিদ্র পেলুম না, একেবারে নিরেট নিভাঁজ,—লোহার মত শক্ত।"

"কিন্তু ছিদ্র আছে, বেশ বড় রকম ছিদ্র এবং সেই ছিদ্র-পথেই আমরা বাড়ীতে ঢুকে পড়েছি। কি জানি কেন, বড় বড় লোকের মধ্যেই এই দুর্ব্বলতা সব বেশী দেখা যায়। যার যত বেশী বুদ্ধি, বুদ্ধির অহঙ্কার তার চতুর্গুণ। ফলে বুদ্ধি থেকেও কোন লাভ হয় না।"

"হেঁয়ালিতে কথা কইছ। একটু পরিষ্কার ক'রে বল।"

"বুড়োর প্রধান দুর্ব্বলতা হচ্ছে—বুদ্ধির অহঙ্কার। সেটা গোড়াতে বুঝে নিয়েছিলুম বলেই সেই অহঙ্কারে ঘা দিয়ে কাজ হাসিল ক'রে নিয়েছি। বাড়ীতে যখন ঢুকতে পেরেছি, তখন ত আট আনা কাজ হয়ে গেছে। এখন বাকী শুধু হীরাটা খুঁজে বার করা।"

"তুমি কি আবার ও-বাড়ীতে মাথা গলাবে না কি?"

"আলবৎ গলাব। বল কি, এত বড় সুযোগ ছেড়ে দেব?"

"এবার গেলেই ঐ বেটা উজ্‌রে সিং পেটের মধ্যে কুক্‌রি পুরে দেবে। যা হয় কর, আমি আর এর মধ্যে নেই।"

হাসিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"তা কি হয়, তোমাকেও চাই; এক যাত্রায় পৃথক্ ফল কি ভাল?"

পরদিন একটু সকাল সকাল স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। বিনা টিকিটে রেলে চড়িতে গেলে মনের অবস্থা যেরূপ হয়, সেই রকম ভয়ে ভয়ে বাড়ীর সম্মুখীন হইলাম। কিন্তু দরোয়ানরা কেহ বাধা দিল না; উজ্‌রে সিং আজ আমাদের দেখিয়াও যেন দেখিতে পাইল না। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্যোমকেশ একটা বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে, গৃহস্বামী ষ্টুডিওতে আছেন।

অতঃপর আমাদের রত্ন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এত বড় বাড়ীর মধ্যে সুপারির মত একখণ্ড জিনিস খুঁজিয়া বাহির করিবার দুঃসাহস এক

ব্যোমকেশেরই থাকিতে পারে, অন্য কেহ হইলে কোনকালে নিরুৎসাহ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিত। খড়ের গাদার মধ্য হইতে ছুঁচ খুঁজিয়া বাহির করাও বোধ করি ইহার তুলনায় সহজ। প্রথমতঃ, মূল্যবান্ জিনিসপত্র লোক যেখানে রাখে অর্থাৎ আলমারী কি সিন্দুকে অনুসন্ধান করা বৃথা। বুড়া অতিশয় ধূর্ত্ত—সে জিনিস সেখানে রাখিবে না। তবে কোথায় রাখিয়াছে? এড্গার অ্যালেন্ পো'র একটা গল্প বহুদিন পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম মনে পড়িল। তাহাতেও এমনই কি একটা দলিল খোঁজাখুঁজির ব্যাপার ছিল। শেষে বুঝি নিতান্ত প্রকাশ্য স্থান হইতে সেটা বাহির হইয়া পড়িল।

ব্যোমকেশ কিন্তু অলস কল্পনায় সময় কাটাইবার লোক নয়। সে রীতিমত খানাতল্লাস স্বরু করিয়া দিল। দেয়ালে টোকা মারিয়া কোথাও ফাঁপা আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। বড় বড় পুস্তকের আলমারী খুলিয়া প্রত্যেকটি বই নামাইয়া পরীক্ষা করিল। স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ীখানা চিত্র ও মূর্ত্তির একটা কলা-ভবন (gallery) বলিলেই হয়, ঘরে ঘরে নানা প্রকার সুন্দর ছবি ও মূর্ত্তির প্ল্যাষ্টার-কাষ্ট্ সাজানো রহিয়াছে, অন্য আসবাব খুব কম। সুতরাং মোটামুটি অনুসন্ধান শেষ করিতে দুই ঘণ্টার বেশী সময় লাগিল না। সর্ব্বত্র বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে আমরা গৃহস্বামীর ষ্টুডিও ঘরে গিয়া হানা দিলাম।

দরজায় টোকা মারিতেই ভিতর হইতে গম্ভীর গর্জ্জন হইল,—"এস।"

ঘরটা বেশ বড়, তাহার এক দিকের সমস্ত দেয়াল জুড়িয়া লম্বা একটা টেবল চলিয়া গিয়াছে। টেবিলের উপর নানা চেহারার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সাজানো রহিয়াছে। আমরা প্রবেশ করিতেই স্যর দিগিন্দ্র হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"কি হে ব্যোমকেশ বাবু, পরশ মাণিক পেলে? তোমাদের কবি লিখেছেন না, 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে

ফিরে পরশ পাথর'? তোমার দশাও সেই ক্ষ্যাপার মত হবে দেখছি, শেষ পর্য্যন্ত মাথায় বৃহৎ জটা গজিয়ে যাবে।"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আপনার লোহার সিন্দুকটা একবার দেখব মনে করছি।"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—"বেশ বেশ। এই নাও চাবি। আমিও তোমার সঙ্গে গিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে পারতাম; কিন্তু এই প্ল্যাষ্টার-কাষ্টটা ঢালাই করতে একটু সময় লাগবে। যাই হোক, অজিত বাবু তোমার সাহায্য করতে পারবেন। আর যদি দরকার হয়, উজ্‌রে সিং—"

তাঁহার শ্লেষোক্তিতে বাধা দিয়া ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"ওটা আপনি কি করছেন?"

মৃদুমন্দ হাস্য করিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন,—"আমার তৈরী নটরাজ-মূর্ত্তির নাম শুনেছ ত? এটা তারই একটা ছোট প্ল্যাষ্টার-কাষ্ট তৈরী করছি। আর একটা আমার টেবলের উপর রাখা আছে, দেখে থাকবে। কাগজ-চাপা হিসেবে জিনিসটা মন্দ নয়—কি বল?"

মনে পড়িল স্যর দিগিন্দ্রের বসিবার ঘরে টেবলের উপর একটি অতি সুন্দর ছোট নটরাজ মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম। ওটা তখনই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু উহাই যে স্যর দিগিন্দ্রের নির্ম্মিত বিখ্যাত মূর্ত্তির মিনিয়েচাব, তাহা তখন কল্পনা করি নাই। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম,—"ঐ মূর্ত্তিটাই আপনি প্যারিসে একৃজিবিট করিয়েছিলেন?"

স্যর দিগিন্দ্র তাচ্ছীল্যভরে বলিলেন,—"হ্যাঁ। আসল মূর্ত্তিটা পাথরে গড়া—সেটা এখনও ল্যুভারে আছে।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। লোকটার সর্ব্বতোমুখী অসামান্যতা আমাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই, ব্যোমকেশ

যখন সিন্দুক খুলিয়া তন্ন তন্ন করিতে লাগিল, আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। এত বড় একটা প্রতিভার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়ের আশা কোথায়?

অনুসন্ধান শেষ করিয়া ব্যোমকেশ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,—"নাঃ, কিছু নেই। চল, বাইরের ঘরে একটু বসা যাক।"

বসিবার ঘরে ফিরিয়া দেখিলাম স্যর দিগিন্দ্র ইতিমধ্যে আসিয়া বসিয়াছেন এবং মুখের অনুযায়ী একটি স্থূল চুরুট দাঁতে চাপিয়া ধূম উদ্গীরণ করিতেছেন। আমরা বসিলে তিনি ব্যোমকেশের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন,—"পেলে না? আচ্ছা, কুছ পরোয়া নেই। একটু জিরিয়ে নাও, তার পর আবার খুঁজো।" ব্যোমকেশ নিঃশব্দে চাবির গোছা ফেরৎ দিল; সেটা পকেটে ফেলিয়া আমার পানে ফিরিয়া স্যর দিগিন্দ্র কহিলেন,—"ওহে অজিত বাবু, তুমি ত গল্প-টল্প লিখে থাকো; সুতরাং একজন বড় দরের আর্টিষ্ট! বল দেখি, এ পুতুলটি কেমন?" —বলিয়া সেই নটরাজ-মূর্ত্তিটি আমার হাতে দিলেন।

ছয় ইঞ্চি লম্বা এবং ইঞ্চি তিনেক চওড়া মূর্ত্তিটি। কিন্তু ঐটুকু পরিসরের মধ্যে কি অপূর্ব্ব শিল্প-প্রতিভাই না প্রকাশ পাইয়াছে! নটরাজের প্রলয়ঙ্কর নৃত্যোন্মাদনা যেন ঐ ক্ষুদ্র মূর্ত্তির প্রতি অঙ্গ হইতে মথিত হইয়া উঠিতেছে। কিছুক্ষণ মুগ্ধভাবে নিরীক্ষণ করিবার পর আপনিই মুখ দিয়া বাহির হইল,—"চমৎকার! এর তুলনা নেই।"

ব্যোমকেশ নিস্পৃহভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"এটাও কি আপনি নিজে মোল্ড করেছেন?"

একরাশি ধূম উদ্গীর্ণ করিয়া স্যর দিগিন্দ্র বললেন,—"হ্যাঁ। আমি ছাড়া আর কে করবে?"

ব্যোমকেশ মূর্ত্তিটা আমার হাত হইতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে বলিল,—"এ জিনিষ বাজারে পাওয়া যায় না বোধ হয়?"

স্যর দিগিন্দ্র বলিলেন,—"না। কেন বল দেখি? পাওয়া গেলে কিনতে না কি?"

"বোধ হয় কিনতুম। আপনিই এই রকম প্লাষ্টার-কাষ্ট তৈরী করিয়ে বাজারে বিক্রী করেন না কেন? আমার বিশ্বাস, এতে পয়সা আছে।"

"পয়সার যদি কখনও অভাব হয়, তখন দেখা যাবে। আপাততঃ জিনিসটাকে বাজারে বিক্রী ক'রে খেলো করতে চাই না।"

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল,—"এখন তা হলে উঠি। আবার ও বেলা আসব।" বলিয়া মূর্ত্তিটা ঠক্ করিয়া টেবলের উপর রাখিল।

স্যর দিগিন্দ্র চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"তুমি ত আচ্ছা বেকুব হে। এখনই ওটা ভেঙেছিলে!" তার পর বাঘের মত ব্যোমকেশের দিকে তাকাইয়া রুদ্ধ গর্জ্জনে বলিলেন,—"তোমাদের একবার সাবধান ক'রে দিয়েছি, আবার বলছি, আমার কোন ছবি বা মূর্ত্তি যদি ভেঙেছ, তা হ'লে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী থেকে বার ক'রে দেব, আর ঢুকতে দেব না। বুঝেছ?"

ব্যোমকেশ অনুতপ্তভাবে মার্জ্জনা চাহিলে তিনি ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন, —"এই সব সুকুমার কলার অযত্ন আমি দেখতে পারি না। যা হোক, ও বেলা তা হ'লে আবার আসছ। বেশ কথা, উদ্যোগিনং পুরুষসিংহ— এবার বাড়ীর কোন্ দিকটা খুঁজবে মনস্থ করেছ? বাগান কুপিয়ে যদি দেখতে চাও, তারও বন্দোবস্ত ক'রে রাখ্তে পারি।"

বিদ্রূপবাণ বেবাক হজম করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। রাস্তায় পড়িয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"চল, এতক্ষণে ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরী খুলেছে, একবার ওদিকটা ঘুরে যাওয়া যাক। একটু দরকার আছে।"

ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়া ব্যোমকেশ বিলাতী বিশ্বকোষ হইতে প্লাষ্টার-কাষ্টিং অংশটা খুব মন দিয়া পড়িল। তারপর বই ফিরাইয়া দিয়া বাহির হইয়া আসিল। লক্ষ্য করিলাম, কোন কারণে সে বেশ একটু

উত্তেজিত হইয়াছে। বাড়ী পৌঁছিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হে, প্লাষ্টার-কাষ্টিং সম্বন্ধে এত কৌতূহল কেন?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"তুমি ত জানো, সকল বিষয়ে কৌতূহল আমার একটা দুর্ব্বলতা।"

"তা ত জানি। কিন্তু কি দেখলে?"

"দেখলুম প্লাষ্টার-কাষ্টিং খুব সহজ, যে-কেউ করতে পারে। খানিকটা প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস জলে গুলে যখন সেটা দইয়ের মত ঘন হয়ে আসবে, তখন মাটির বা মোমের ছাঁচের মধ্যে আস্তে আস্তে ঢেলে দাও। মিনিট দশেকের মধ্যেই সেটা জমে শক্ত হয়ে যাবে, তখন ছাঁচ থেকে বার ক'রে নিলেই হয়ে গেল। এর মধ্যে শক্ত যা-কিছু ঐ ছাঁচটা তৈরী করা।"

"এই। তা এর জন্য এত দুর্ভাবনা কেন?"

"দুর্ভাবনা নেই। ছাঁচে প্লাষ্টার অফ্ প্যারিস ঢালবার সময় যদি একটা সুপুরি কি ঐ জাতীয় কোন শক্ত জিনিস সেই সঙ্গে ঢেলে দেওয়া যায়, তা হ'লে সেটা মূর্ত্তির মধ্যে রয়ে যাবে।"

"অর্থাৎ?"

কৃপাপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"অর্থাৎ বুঝ লোক যে জান সন্ধান।"

বৈকালে আবার স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ী গেলাম। এবারও তন্ন তন্ন করিয়া বাড়ীখানা খোঁজা হইল, কিন্তু কোনই ফল হইল না। স্যর দিগিন্দ্র মাঝে মাঝে আসিয়া আমাদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে যখন ক্লান্ত হইয়া আমরা বসিবার ঘরে আসিয়া উপবিষ্ট হইলাম, তখন তিনি আমাদের ভারি পরিশ্রম হইয়াছে বলিয়া চা ও জলখাবার আনাইয়া দিয়া আমাদের প্রতি আতিথ্যের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া দিলেন। আমার ভারি লজ্জা করিতে লাগিল, কিন্তু ব্যোমকেশ একেবারে বেহায়া,

—সে অম্লান-বদনে সমস্ত ভোজ্যপেয় উদরসাৎ করিতে করিতে অমায়িক-ভাবে স্যর দিগিন্দ্রের সহিত গল্প করিতে লাগিল।

স্যর দিগিন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কতদিন চালাবে? এখনও আশ মিটল না?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আজ বুধবার। এখনও দুদিন সময় আছে।"

স্যর দিগিন্দ্র অট্টহাস্য করিতে লাগিলেন। ব্যোমকেশ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া টেবলের উপর হইতে নটরাজের পুতুলটা তুলিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"এটা কত দিন হ'ল তৈরী করেছেন?"

ভ্রূকুটি করিয়া স্যর দিগিন্দ্র চিন্তা করিলেন, পরে বলিলেন,—"দিন পনের-কুড়ি হবে। কেন?"

"না—অমনি। আচ্ছা, আজ উঠি। কাল আবার আসব। নমস্কার।" বলিয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাড়ী ফিরিতেই চাকর পুঁটিরাম একখানা খাম ব্যোমকেশের হাতে দিয়া বলিল,—"একজন তক্‌মা-পরা চাপরাসী দিয়ে গেছে!"

খামের ভিতর শুধু একটি ভিজিটিং কার্ড, তাহার এক পিঠে ছাপার অক্ষরে লেখা আছে—কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়। অন্য পিঠে পেন্সিল দিয়া লেখা,—"এইমাত্র কলিকাতায় পৌঁছিয়াছি। গ্রাণ্ডহোটেলে আছি। কত দূর?"

ব্যোমকেশ কার্ডখানা টেবলের এক পাশে রাখিয়া দিয়া আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িল; কড়ি-কাঠের দিকে চোখ তুলিয়া চুপ করিয়া রহিল। কুমার বাহাদুর হঠাৎ আসিয়া পড়ায় সে মনে মনে খুসী হয় নাই বুঝিলাম। প্রশ্ন করাতে সে বলিল,—"এক পক্ষের উৎকণ্ঠা অনেক সময় অন্য পক্ষে সঞ্চারিত হয়। কুমার বাহাদুরের আসার ফলে বুড়ো যদি ভয় পেয়ে মতলব বদলায়, তা হ'লেই সব মাটী। আবার নূতন ক'রে কাজ আরম্ভ করতে হবে।"

সমস্ত সন্ধ্যাটা সে একভাবে আরাম-চেয়ারে পড়িয়া রহিল। রাত্রে আমরা দু'জনে একই ঘরে দুইটি পাশাপাশি খাটে শয়ন করিতাম, বিছানায় শুইয়া অনেকক্ষণ গল্প চলিত। আজ কিন্তু ব্যোমকেশ একটা কথাও কহিল না। আমি কিছুক্ষণ এক-তরফা কথা কহিয়া শেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতে ছিলাম যে আমি, ব্যোমকেশ ও স্যর দিগিন্দ্র হীরার মার্ব্বেল দিয়া গুলি খেলিতেছি, মার্ব্বেলগুলি ব্যোমকেশ সমস্ত জিতিয়া লইয়াছে, স্যর দিগিন্দ্র মাটীতে পা ছড়াইয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় চমকিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল।

চোখ খুলিয়া দেখিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে আমার খাটের পাশে বসিয়া আছে। আমার নিশ্বাসের শব্দে বোধ হয় বুঝিতে পারিল আমি জাগিয়াছি, বলিল,—"দেখ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, হীরাটা বসবার ঘরে টেবিলের উপর কোনো খানে আছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"রাত্রি কটা?"

ব্যোমকেশ বলিল,—"আড়াইটে। তুমি একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ? বুড়ো বসবার ঘরে ঢুকেই প্রথমে টেবিলের দিকে তাকায়।"

আমি পাশ ফিরিয়া শুইয়া বলিলাম,—"তাকাক্, তুমি এখন চোখ বুজে শুয়ে পড় গে।"

ব্যোমকেশ নিজ মনেই বলিতে লাগিল,—"টেবিলের দিকে তাকায় কেন? নিশ্চয়,—দেরাজের মধ্যে? না। যদি থাকে ত টেবিলের উপরই আছে। কি কি জিনিস আছে টেবিলের উপর? হাতীর দাঁতের দোয়াত-দান, টাইমপিস ঘড়ী, গঁদের শিশি, কতকগুলো বই, ব্লটিং প্যাড, সিগারের বাক্স, পিনকুশন, নটরাজ—"

শুনিতে শুনিতে আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। রাত্রে যতবার ঘুম ভাঙিল, অনুভব করিলাম, ব্যোমকেশ অন্ধকারে ঘরময় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

সকালে ব্যোমকেশ কুমার ত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণকে একখানা চিঠি লিখিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল! সংক্ষেপে জানাইল যে, চিন্তার কোনও কারণ নাই, শনিবার কোনও সময় দেখা হইবে।

তারপর আবার দুইজনে বাহির হইলাম। ব্যোমকেশের মুখ দেখিয়া বুঝিলাম, সারারাত্রি জাগরণের ফলে সে মনে মনে কোনও একটা সঙ্কল্প করিয়াছে।

স্যর দিগিন্দ্র আজ বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সাড়ম্বরে সম্ভাষণ করিলেন,—"এই যে মাণিক-জোড়, এস, এস। আজ যে ভারী সকাল সকাল? ওরে কে আছিস, বাবুদের চা দিয়ে যা। ব্যোমকেশ বাবুকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখছি! দুশ্চিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় নি বুঝি?"

ব্যোমকেশ টেবল হইতে নটরাজের মূর্ত্তিটি হাতে লইয়া আস্তে আস্তে বলিল,—"এই পুতুলটিকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। কাল সমস্ত রাত্রি এর কথা ভেবেই ঘুমোতে পারি নি।"

পূর্ণ এক মিনিটকাল দুজনে পরস্পরের চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে নিঃশব্দে মনে মনে কি যুদ্ধ হইল বলিতে পারি না, এক মিনিট পরে স্যর দিগিন্দ্র সকৌতুকে হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন,—"ব্যোমকেশ, তোমার মনের কথা আমি বুঝেছি। অত সহজে এ বুড়োকে ঠকাতে পারবে না। ওটার জন্যে রাত্রে তোমার ঘুম হয় নি বলছিলে, বেশ, তোমাকে ওটা আমি দান করলাম।"

ব্যোমকেশের হতবুদ্ধি মুখের দিকে ব্যঙ্গপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিলেন,—"কেমন? হ'ল ত? কিন্তু মূর্ত্তিটা দামী জিনিস, ভেঙে নষ্ট করো না।"

মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"ধন্যবাদ।" বলিয়া মূর্ত্তিটি রুমালে মুড়িয়া পকেটে পূরিল।

তার পর যথারীতি ব্যর্থ অনুসন্ধান করিয়া বেলা দশটা নাগাদ বাসায়

ফিরিলাম। চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া ব্যোমকেশ সনিশ্বাসে বলিল,—"না, ঠকে গেলুম।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি ব্যাপার বল ত? আমি ত তোমাদের কথা-বার্ত্তা ভাব-ভঙ্গি কিছুই বুঝতে পারলুম না।"

পকেট হইতে পুতুলটা বাহির করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"নানা কারণে আমার স্থিরবিশ্বাস হয়েছিল যে, এই নটরাজের ভিতরে হীরাটা আছে। ভেবে দেখ, এমন সুন্দর লুকোবার যায়গা হ'তে পারে কি? হীরাটা চোখের সামনে টেবলের উপর রয়েছে, অথচ কেউ দেখতে পাচ্ছে না। পুতুলটা স্যর দিগিন্দ্র নিজে ছাঁচে ঢালাই করেছেন, সুতরাং প্লাষ্টারের সঙ্গে সঙ্গে হীরাটা ছাঁচের মধ্যে ঢেলে দেওয়া কিছুমাত্র শক্ত কাজ নয়। তাতে স্যর দিগিন্দ্রের মনস্কামনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে হীরাটার প্রতি তাঁর এত ভালবাসা, সেটা সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকে, অথচ কারুর সন্দেহ হয় না। যে দিক্ থেকেই দেখ, সমস্ত যুক্তি অনুমান ঐ পুতুলটার দিকে নির্দ্দেশ করছে। তাই আমার নিঃসংশয় ধারণা হয়েছিল যে, হীরাটা আর কোথাও থাকতে পারে না। আজ ঠিক ক'রে বেরিয়েছিলুম যে পুতুলটা চুরি করব। কিন্তু বুড়োর কাছে ঠকে গেলুম। শুধু তাই নয়, বুড়ো আমার মনের ভাব বুঝে বিদ্রূপ ক'রে পুতুলটা আমায় দান ক'রে দিলে! কাটা ঘায়ে নুণের ছিটে দিতে বুড়ো এক নম্বর। মোটের উপর আমার থিয়োরিটাই ভেস্তে গেল। এখন আবার গোড়া থেকে সুরু করতে হবে।"

আমি বলিলাম,—"কিন্তু সময়ও ত আর নেই। মাঝে মাত্র এক দিন।"

ব্যোমকেশ পুতুলটার নীচে পেন্সিল দিয়া ক্ষুদ্র অক্ষরে নিজের নামের আদ্যক্ষরটা লিখিতে লিখিতে বলিল,—"মাত্র একদিন। বোধ হয় প্রতিজ্ঞা-রক্ষা হয় না। এ দিকে কুমার বাহাদুর এসে থানা দিয়ে ব'সে

আছেন। নাঃ, বুড়ো সব দিক্ দিয়েই হাস্যাস্পদ ক'রে দিলে। লাভের মধ্যে দেখছি কেবল এই পুতুলটা!" মুখের একটা ভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ মূর্ত্তিটা টেবলের উপর রাখিয়া দিল, তার পর বুকে ঘাড় গুঁজিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

বৈকালে নিয়মমত স্যর দিগিন্দ্রের বাড়ীতে গেলাম। শুনিলাম কর্ত্তা এইমাত্র বাহিরে গিয়াছেন। ব্যোমকেশ তখন নূতন পথ ধরিল, আমাকে সরিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া উজ্‌রে সিং থাপার সহিত ভাব জমাইবার চেষ্টা আরম্ভ করিল। আমি একাকী বাগানে বেড়াইতে লাগিলাম; ব্যোমকেশ ও উজ্‌রে সিং বারান্দায় দুই টুলে বসিয়া অমায়িকভাবে আলাপ করিতেছে, মাঝে মাঝে চোখে পড়িতে লাগিল। ব্যোমকেশ ইচ্ছা করিলে খুব সহজে মানুষের মন ও বিশ্বাস জয় করিয়া লইতে পারিত। কিন্তু উজ্‌রে সিং থাপার পাহাড়ী হৃদয় গলাইতে তাহার পেট হইতে কথা বাহির করিতে পারিবে কি না, এ বিষয়ে আমার মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল।

ঘণ্টা দুই পরে আবার যখন দুজনে পথে বাহির হইলাম, তখন ব্যোমকেশ বলিল,—"কিছু হ'ল না। উজ্‌রে সিং লোকটি হয় নিরেট বোকা, নয় আমার চেয়ে বুদ্ধিমান।"

বাসায় ফিরিয়া আসিলে চাকর খবর দিল যে একটি লোক দেখা করিতে আসিয়াছিল, আমাদের আশায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া—আবার আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ ক্লান্তভাবে বলিল,—"কুমার বাহাদুরের পেয়াদা।"

এই ব্যর্থ ঘোরাঘুরি ও অন্বেষণে আমিও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, বলিলাম,—"আর কেন ব্যোমকেশ, ছেড়ে দাও। এ যাত্রা কিছু হ'ল না। কুমার সাহেবকেও জবাব দিয়ে দাও, মিছে তাঁকে সংশয়ের মধ্যে রেখে কোনও লাভ নেই।"

টেবলের সম্মুখে বসিয়া নটরাজ মূর্ত্তিটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে ম্রিয়মাণ কণ্ঠে ব্যোমকেশ বলিল,—"দেখি, কালকের দিনটা এখনও হাতে আছে। যদি কাল সমস্ত দিনে কিছু না করতে পারি—" তাহার মুখের কথা শেষ হইল না। চোখ তুলিয়া দেখি, তাহার মুখ উত্তেজনায় লাল হইয়া উঠিয়াছে, সে নিষ্পলক বিস্ফারিত দৃষ্টিতে নটরাজ-মূর্ত্তিটার দিকে তাকাইয়া আছে।

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হ'ল ?"

ব্যোমকেশ কম্পিতহস্তে মূর্ত্তিটা আমার চোখের সম্মুখে ধরিয়া বলিল, "দেখ দেখ—নেই! মনে আছে, আজ সকালে পেন্সিল দিয়ে পুতুলটার নীচে একটা 'ব' অক্ষর লিখেছিলুম ? সে অক্ষরটা নেই !"

দেখিলাম সত্যই অক্ষরটা নাই। কিন্তু সেজন্য এত বিচলিত হইবার কি আছে ? পেন্সিলের লেখা—মুছিয়া যাইতেও ত পারে !

ব্যোমকেশ বলিল,—"বুঝতে পারছ না ? বুঝতে পারছ না ?" হঠাৎ সে হো হো করিয়া উঠিল,—"উঃ, বুড়ো কি ধাপ্পাই দিয়েছে ! একেবারে উল্লুক বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল হে ! যা হোক, বাঘেরও রোগ আছে।—পুঁটিরাম !"

ভৃত্য পুঁটিরাম আসিলে ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"যে লোকটি আজ এসেছিল, তাকে কোথায় বসিয়েছিলে ?"

"আজ্ঞে, এই ঘরে।"

"তুমি বরাবর এ ঘরে ছিলে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে মাঝে তিনি এক গেলাস জল চাইলেন, তাই—"

"আচ্ছা—যাও।"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া হাসিতে লাগিল, তার পর উঠিয়া পাশের ঘরে যাইতে যাইতে বলিল,—"তুমি শুনে হয় ত আশ্চর্য্য হবে,—হীরাটা আজ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্য্যন্ত এই টেবলের উপর রাখা ছিল।"

আমি অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম। বলে কি? হঠাৎ মাথা খারাপ হইয়া গেল না কি?

পাশের ঘর হইতে ব্যোমকেশ ফোন্ করিতেছে শুনিতে পাইলাম—"কুমার ত্রিদিবেন্দ্র? হ্যাঁ, আমি ব্যোমকেশ। কাল বেলা দশটার মধ্যে পাবেন। আপনার স্পেশাল ট্রেণ যেন ঠিক থাকে, পাবামাত্র রওনা হবেন। না, এখানে থাকা বোধ হয় নিরাপদ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা, ও সব কথা পরে হবে। ভুলবেন না। সাড়ে দশটার মধ্যে কলকাতা ছাড়া চাই। আচ্ছা, আপনার কিছু ক'রে কাজ নেই—স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত আমি ক'রে রাখব। কাউকে কিছু বলবেন না;—না আপনার সেক্রেটারীকেও নয়—আচ্ছা নমস্কার।"

তার পর হ্যাটকোট পরিয়া বোধ করি স্পেশাল ট্রেণের বন্দোবস্ত করিতে বাহির হইল। 'ফিরতে রাত হবে—তুমি শুয়ে পোড়ো' আমাকে শুধু এইটুকু বলিয়া গেল।

রাত্রে ব্যোমকেশ কখন্ ফিরিল, জানিতে পারি নাই। সকালে সাড়ে আটটার সময় যথারীতি দু'জনে বাহির হইলাম। বাহির হইবার সময় দেখিলাম, নটরাজ-মূর্ত্তিটা যথাস্থানে নাই। সে দিকে ব্যোমকেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে সে বলিল,—"আছে! সেটাকে সরিয়ে রেখেছি।"

স্তর দিগিন্দ্র তাঁহার বসিবার ঘরেই ছিলেন, আমাদের দেখিয়া বলিলেন,—"তোমাদের দৈনিক আক্রমণ আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। এমন কি, যতক্ষণ তোমরা আস নি, একটু ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছিল।"

ব্যোমকেশ বিনীতভাবে বলিল,—"আপনার উপর অনেক জুলুম করেছি, কিন্তু আর করব না, এই কথাটা আজ জানাতে এলুম। জয়-পরাজয় এক পক্ষের আছেই, সে জন্য দুঃখ করা মূঢ়তা। কাল থেকে আর আমাদের দেখতে পাবেন না। আপনি অবশ্য জানেন যে, আপনার

ভাইপো এখানে গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে আছেন,—তাঁকে কাল একরকম জানিয়েই দিয়েছি যে তাঁর এখানে থেকে আর কোনও লাভ নেই। আজ তাঁকে শেষ জবাব দিয়ে যাব।”

স্যর দিগিন্দ্র কিছুকাল কুঞ্চিত-চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিলেন; ক্রমে তাঁহার মুখে সেই বুল্‌ডগ-হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিলেন,—“তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে খুসী হলাম। খোকাকে বলো বৃথা চেষ্টা ক’রে যেন সময় নষ্ট না করে।”

“আচ্ছা, বল্‌ব।”—টেবলের উপর আর একটি নটরাজমূর্ত্তি রাখা হইয়াছে দেখিয়া সেটা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ বলিল,—“এই যে আর একটা তৈরী করেছেন দেখছি। আপনার উপহারটি আমি যত্ন ক’রে রেখেছি; শুধু সৌন্দর্য্যের জন্য নয়, আপনার স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেও আমার কাছে তার দাম অনেক।—কিন্তু যদি কখনও দৈবাৎ ভেঙে যায়,—আর একটা পাব কি?”

স্যর দিগিন্দ্র প্রসন্নভাবে বলিলেন,—“বেশ, যদি ভেঙে যায়, আর একটা পাবে। আমার বাড়ীতে ঢুকে তোমার শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ জন্মেছে, এটাও কম লাভ নয়।”

গভীর বিনয় সহকারে ব্যোমকেশ বলিল,—“আজ্ঞে হ্যাঁ। এত দিন আমার মনের ওদিকটা একেবারে পর্দ্দা ঢাকা ছিল। কিন্তু এই ক’দিন আপনার সংসর্গে এসে ললিত-কলার রস পেতে আরম্ভ করেছি, বুঝেছি, ওর মধ্যে কি অমূল্য রত্ন লুকোনো আছে।—ঐ ছবিখানাও আমার বড় ভাল লাগে। ওটা কি আপনারই আঁকা?” স্যর দিগেন্দ্রের পশ্চাতে দেয়ালের গায়ে একটা সুন্দর নিসর্গ দৃশ্যের ছবি টাঙানো ছিল ব্যোমকেশ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

মুহূর্ত্তের জন্য স্যর দিগিন্দ্র ঘাড় ফিরাইলেন। সেই ক্ষণিক অবকাশে ব্যোমকেশ এক অদ্ভুত হাতের কসরৎ দেখাইল। টিকটিকি যেমন করিয়া

শিকার ধরে, তেমনি ভাবে তাহার একটা হাত টেবলের উপর হইতে নটরাজমূর্ত্তিটা তুলিয়া লইয়া পকেটে পুরিল এবং অন্য হাতটা সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নটরাজ-মূর্ত্তি তাহার স্থানে বসাইয়া দিল। স্যর দিগিন্দ্র যখন আবার সম্মুখে ফিরিলেন, তখন ব্যোমকেশ পূর্ব্ববৎ মুগ্ধভাবে দেয়ালের ছবিটার দিকে চাহিয়া আছে।

আমার বুকের ভিতরটা এমন অসম্ভব রকম ধড়ফড় করিতে লাগিল যে, স্যর দিগিন্দ্র যখন সহজ কণ্ঠে বলিলেন,—"হ্যাঁ, ওটা আমারই আঁকা," তখন কথাগুলা আমার কানে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দূরাগত বলিয়া মনে হইল। ভাগ্যে সে সময় তিনি আমার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে নাই, নতুবা ব্যোমকেশের হাতের কসরৎ হয় ত আমার মুখের উদ্বেগ হইতে ধরা পড়িয়া যাইত।

ব্যোমকেশ ধীরে সুস্থে উঠিয়া বলিল,—"এখন তা হ'লে আসি। আপনার সংসর্গে এসে আমার ভালই হয়েছে, এ কথা আমি কখনও ভুলব না। আশা করি, আপনিও আমাদের ভুলতে পারবেন না। যদি কখনও দরকার হয়,—মনে রাখ্‌বেন, আমি একজন সত্যান্বেষী, সত্যের অনুসন্ধান করাই আমার পেশা। চল অজিত। আচ্ছা, চল্লুম তবে,—নমস্কার!"

দরজার নিকট হইতে একবার ফিরিয়া দেখিলাম, স্যর দিগিন্দ্র ভ্রূকুটি করিয়া সন্দেহ-প্রখর দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন, যেন ব্যোমকেশের কথার কোন্ একটা অতি গূঢ় ইঙ্গিত বুঝি-বুঝি করিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না।

বাড়ীর বাহিরে আসিতেই একটা খালি ট্যাক্সি পাওয়া গেল; তাহাতে চড়িয়া বসিয়া ব্যোমকেশ হুকুম দিল,—"গ্র্যাণ্ড হোটেল।"

আমি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম,—"ব্যোমকেশ, এসব কি কাণ্ড?"

ব্যোমকেশ হাসিয়া বলিল,—"এখনও বুঝতে পারছ না, এই আশ্চর্য্য। আমি যে অনুমান করেছিলুম হীরাটা নটরাজের মধ্যে আছে, তা ঠিকই আন্দাজ করেছিলুম। বুড়ো বুঝতে পেরে আমাকে ধোঁকা দেবার জন্যে পুতুলটা আমাকে দিয়ে দিয়েছিল। তার পর আর একটা ঠিক ঐ রকম মূর্ত্তি তৈরি ক'রে কাল সন্ধ্যাবেলা গিয়ে আসলটার সঙ্গে বদল ক'রে এনেছিল। যদি এই অস্পষ্ট 'ব' অক্ষরটি লেখা না থাকত, তা হ'লে আমি জানতেও পারতুম না!" বলিয়া পুতুলটা উল্টাইয়া দেখাইল। দেখিলাম, পেন্সিলে লেখা অক্ষরটি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—"কাল যখন এই 'ব' অক্ষরটি যথাস্থানে দেখতে পেলুম না, তখন এক নিমেষে সমস্ত ব্যাপার আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়ে গেল। আজ প্রথমে গিয়েই বুড়োর টেবল থেকে নটরাজটি উল্টে দেখলুম,—আমার সেই 'ব' মার্কা নটরাজ। অন্য মূর্ত্তিটা পকেটেই ছিল। বাস্! তার পর হাত-সাফাই ত দেখতেই পেলে।"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলিলাম,—"তুমি ঠিক জানো, হীরাটা ওর মধ্যেই আছে?"

"হ্যাঁ। ঠিক জানি—কোনও সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু যদি না থাকে?"

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, শেষে বলিল,—"তা হ'লে বুঝব, পৃথিবীতে সত্য ব'লে কোনও জিনিস নেই; শাস্ত্রের অনুমান-খণ্ডটা একেবারে মিথ্যা।"

গ্র্যাণ্ড হোটেলে কুমার ত্রিদিবেন্দ্র একটা আস্ত স্যুট ভাড়া করিয়াছিলেন, আমরা তাঁহার বসিবার ঘরে পদার্পণ করিতেই তিনি দুই হাত বাড়াইয়া ছুটিয়া আসিলেন,—"কি? কি হ'ল, ব্যোমকেশ বাবু?"

ব্যোমকেশ নিঃশব্দে নটরাজ-মূর্ত্তিটি টেবিলের উপর রাখিয়া তাহার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল।

হতবুদ্ধিভাবে কুমার বাহাদুর বলিলেন,—"এটা ত দেখছি কাকার নটরাজ, কিন্তু আমার সীমন্ত-হীরা—"

"ওর মধ্যেই আছে।"

"ওর মধ্যে—?"

"হ্যাঁ, ওরি মধ্যে। কিন্তু আপনার যাবার বন্দোবস্ত সব ঠিক আছে ত? সাড়ে দশটার সময় আপনার স্পেশাল ছাড়বে।"

কুমার বাহাদুর অস্থির হইয়া বলিলেন,—"কিন্তু আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ওর মধ্যে আমার সীমন্ত-হীরা আছে কি বলছেন?"

"বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, পরীক্ষা ক'রে দেখুন।"

একটা পাথরের কাগজ-চাপা তুলিয়া লইয়া ব্যোমকেশ মূর্ত্তিটার উপর সজোরে আঘাত করিতেই সেটা বহু খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল।

"এই নিন্ আপনার সীমন্ত-হীরা।"—ব্যোমকেশ হীরাটা তুলিয়া ধরিল, তাহার গায়ে তখনও প্ল্যাষ্টার জুড়িয়া আছে, কিন্তু বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ওটা সত্যই হীরা বটে।

কুমার বাহাদুর ব্যোমকেশের হাত হইতে হীরাটা প্রায় কাড়িয়া লইলেন; কিছুক্ষণ একাগ্র নির্ম্মিমেষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া মহোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—"হ্যাঁ, এই আমার সীমন্ত-হীরা। এই যে এর ভিতর থেকে নীল আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে।—ব্যোমকেশ বাবু, আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাব—"

"কিছু বলতে হবে না,আপাততঃ যত শীঘ্র পারেন বেরিয়ে পড়ুন। খুড়ো মশায় যদি ইতিমধ্যে জানতে পারেন, তাহ'লে আবার হীরা হারাতে কতক্ষণ?"

"না না, আমি এখনই বেরুচ্ছি। কিন্তু আপনার—"

"সে পরে হবে। নিরাপদে বাড়ী পৌঁছে তার ব্যবস্থা করবেন।"

কুমার বাহাদুরকে ষ্টেশনে রওনা করিয়া দিয়া আমরা বাসায় ফিরিলাম।

আরাম-কেদারায় অঙ্গ ছড়াইয়া দিয়া ব্যোমকেশ পরম সার্থকতার হাসি হাসিয়া বলিল,—"আমি শুধু ভাবছি, বুড়ো যখন জানতে পারবে, তখন কি করবে?"

দিন কয়েক পরে কুমার বাহাদুরের নিকট হইতে একখানি ইন্সিওর-করা খাম আসিল। চিঠির সঙ্গে একখানি চেক পিন দিয়া আঁটা। চেক্‌এ অঙ্কের হিসাবটা দেখিয়া চক্ষু ঝলসিয়া গেল। পত্রখানি এইরূপ—

প্রিয় ব্যোমকেশ বাবু,

আমার চিরন্তন কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যাহা পাঠাইলাম, জানি আপনার প্রতিভার তাহা যোগ্য নয়। তবু, আশা করি আপনার অমনোনীত হইবে না। ভবিষ্যতে আপনার সহিত সাক্ষাতের প্রত্যাশায় রহিলাম। এবার যখন কলিকাতায় যাইব, আপনার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিব।

অজিত বাবুকেও আমার ধন্যবাদ জানাইবেন। তিনি সাহিত্যিক, সুতরাং টাকার কথা তুলিয়া তাঁহার সারস্বত সাধনার অমর্য্যাদা করিতে চাই না [হায় রে পোড়াকপালে সাহিত্যিক !] কিন্তু যদি তিনি নাম-ধাম বদল করিয়া এই হীরা-হরণের গল্পটা লিখিতে পারেন, তাহা হইলে আমার কোনও আপত্তি নাই জানিবেন। শ্রদ্ধা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

ইতি—প্রতিভামুগ্ধ

শ্রীত্রিদিবেন্দ্রনারায়ণ রায়

মাকড়সার রস

ব্যোমকেশকে এক রকম জোর করিয়াই বাড়ী হইতে বাহির করিয়াছিলাম।

গত একমাস ধরিয়া সে একটা জটিল জালিয়াতির তদন্তে মনোনিবেশ করিয়াছিল; একগাদা দলিল-পত্র লইয়া রাতদিন তাহার ভিতর হইতে অপরাধীর অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল এবং রহস্য যতই ঘনীভূত হইতেছিল ততই তাহার কথা-বার্ত্তা কমিয়া আসিতেছিল। লাইব্রেরী ঘরে বসিয়া নিরন্তর এই শুষ্ক কাগজ-পত্রগুলা ঘাঁটিয়া ঘাঁটিয়া তাহার শরীরও খারাপ হইয়া পড়িতেছে দেখিতেছিলাম, কিন্তু সে-কথার উল্লেখ করিলে সে বলিত,—"নাঃ বেশ ত আছি—"

সে-দিন বৈকালে বলিলাম,—"আর তোমার কথা শোনা হবে না, চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক। দিনের মধ্যে অন্তত দু'ঘণ্টাও ত বিশ্রাম দরকার।"

"কিন্তু—"

"কিন্তু নয়—চল লেকের দিকে। দু'ঘণ্টায় তোমার জালিয়াৎ পালিয়ে যাবে না।"

"চল—" কাগজ সরাইয়া রাখিয়া সে বাহির হইল বটে কিন্তু তাহার মনটা সেই অজ্ঞাত জালিয়াতের পিছু ছাড়ে নাই বুঝিতে কষ্ট হইল না।

লেকের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ একজন বহু পুরাতন কলেজের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। অনেকদিন তাহাকে দেখি নাই; আই, এ, ক্লাশে দুজনে একসঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তারপর সে মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করে। সেই অবধি ছাড়াছাড়ি। আমি তাহাকে দেখিয়া বলিলাম,—"আরে! মোহন যে! তুমি কোত্থেকে?"

সে আমাকে দেখিয়া সহর্ষে বলিল,—"অজিত! তাই ত হে! কদ্দিন পর দেখা! তারপর খবর কি?"

কিছুক্ষণ পরস্পরের পিঠ চাপড়া-চাপড়ির পর ব্যোমকেশের সহিত পরিচয় করিয়া দিলাম। মোহন বলিল,—"আপনিই? বড় খুশি হলুম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'ত বটে, আপনার কীর্ত্তি প্রচারক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় হয় ত আমাদের বাল্য-বন্ধু অজিত; কিন্তু বিশ্বাস হ'ত না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি আজকাল কি করছ?"

মোহন বলিল—"কলকাতাতেই প্র্যাকটিস্ করছি।"

তারপর বেড়াইতে বেড়াইতে নানা কথায় ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। লক্ষ্য করিলাম, সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে, মোহন দু'একবার কি একটা বলিবার জন্য মুখ খুলিয়া আবার থামিয়া গেল। ব্যোমকেশও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই এক সময় অল্প হাসিয়া বলিল,—"কি বল্‌বেন বলুন না।"

মোহন একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—"একটা কথা বলি-বলি করেও বল্‌তে সঙ্কোচ হচ্ছে। ব্যাপারটা এত তুচ্ছ যে সে নিয়ে আপনাকে বিব্রত করা অন্যায়। অথচ—"

আমি বলিলাম,—"তা হোক, বল। আর কিছু না হোক, ব্যোমকেশকে কিছুক্ষণের জন্য জালিয়াতের হাত থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া ত হবে।"

"জালিয়াৎ?"

আমি বুঝাইয়া দিলাম। তখন মোহন বলিল,—"ও! কিন্তু আমার কথা শুনে হয় ত ব্যোমকেশ বাবু হাসবেন—"

ব্যোমকেশ বলিল,—"হাসির কথা হলে নিশ্চয় হাসব, কিন্তু আপনার ভাব দেখে তা ত মনে হচ্ছে না। বরঞ্চ বোধ হচ্চে একটা কোনও সমস্যা কিছুদিন থেকে আপনাকে ভাবিত ক'রে রেখেছে,—আপনি তারই উত্তর খুঁজছেন।"

মোহন সাগ্রহে কহিল,—"আপনি ঠিক ধরেছেন। জিনিসটা হয় ত

খুবই সহজ—কিন্তু আমার পক্ষে এটা একটা দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি নেহাত বোকা নই—সাধারণ সহজ-বুদ্ধি আছে ব'লেই মনে করি; অথচ একজন রোগে পঙ্গু চলৎশক্তিরহিত লোক আমাকে প্রত্যহ এমনভাবে ঠকাচ্ছে যে শুনলে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন; শুধু আমাকে নয়, তার সমস্ত পরিবারের তীক্ষ্ণ সতর্কতা সে প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যর্থ করে দিচ্ছে।”

কথা কহিতে কহিতে আমরা একটা বেঞ্চিতে আসিয়া বসিয়াছিলাম। মোহন বলিল,—“যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলছি—শুনুন। কোনো এক বড় মানুষের বাড়ীতে আমি গৃহ-চিকিৎসক। তাঁরা বনেদী বড়মানুষ, কলকাতায় বন কেটে বাস; অন্যান্য বিষয় সম্পত্তি ছাড়াও কলকাতায় একটা বাজার আছে—তা থেকে মাসিক হাজার পনের টাকা আয়। সুতরাং আর্থিক অবস্থা কি রকম বুঝতেই পারছেন।

“এই বাড়ীর যিনি কর্ত্তা তাঁর নাম নন্দদুলাল বাবু। ইনিই বল্‌তে গেলে এবাড়ীতে আমার একমাত্র রুগী। বয়স কালে ইনি এত বেশী বদ্‌-খেয়ালী করেছিলেন যে পঞ্চাশ বছর বয়স হতে না হতেই শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছে। বাতে পঙ্গু, আরো কত রকম ব্যাধি যে তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে আছে তা গুণে শেষ করা যায় না। তা ছাড়া পক্ষাঘাতের লক্ষণও ক্রমে দেখা দিচ্ছে। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে একটা কথা আছে,—মানুষের মৃত্যুতে বিস্মিত হবার কিছু নেই, মানুষ যে বেঁচে থাকে এইটেই সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়। আমার এই রুগীটিকে দেখলে সেই কথাই সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে।

“এই নন্দদুলাল বাবুর চরিত্র আপনাকে কি করে বোঝাব ভেবে পাচ্ছি না। কটুভাষী, সন্দিগ্ধ-কুটিল, হিংসাপরায়ণ—এক কথায় এমন ইতর নীচ স্বভাব আমি আর কখনো দেখি নি। বাড়ীতে স্ত্রী পুত্র পরিবার সব আছে কিন্তু কারুর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। তাঁর ইচ্ছা, যৌবনে

যে উচ্ছৃঙ্খলতা ক'রে বেড়িয়েছেন এখনো তাই ক'রে বেড়ান্। কিন্তু প্রকৃতি বাদ সেধেছেন, শরীরে সে সামর্থ্য নেই। এই জন্যে পৃথিবীসুদ্ধ লোকের ওপর দারুণ রাগ আর ঈর্ষা,—যেন তাঁর এই অবস্থার জন্যে তারাই দায়ী। সর্ব্বদা ছল খুঁজে বেড়াচ্ছেন কি করে কাকে জব্দ করবেন!

"শরীরের শক্তি নেই,—বুকের গোলমালও আছে,—তাই ঘর ছেড়ে বেরুতে পারেন না; নিজের ঘরে বসে বসে কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ওপর কদর্য্য গালাগাল বর্ষণ করছেন, আর দিস্তেদিস্তে কাগজে অনবরত লিখে চলেছেন। তাঁর এক খেয়াল যে তিনি একজন অদ্বিতীয় সাহিত্যিক; তাই কখনো লাল কালীতে কখনো কালো কালীতে এন্তার লিখে যাচ্ছেন। সম্পাদকের ওপর ভয়ঙ্কর রাগ, তাঁর বিশ্বাস সম্পাদকেরা কেবল শত্রুতা করেই তাঁর লেখা ছাপে না।"

আমি কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি লেখেন?"

"গল্প। কিম্বা আত্ম-চরিতও হতে পারে। একবার মাত্র সে-লেখার ওপর আমি চোখ বুলিয়েছিলুম, তারপর আর সে দিকে তাকাতে পারি নি। সে-লেখা পড়বার পর গঙ্গাস্নান করলেও মন পবিত্র হয় না। আজ-কালকার যাঁরা তরুণ লেখক, সে-গল্প পড়লে তাঁদেরও বোধকরি দাঁত-কপাটি লেগে যাবে।"

ব্যোমকেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"চরিত্রটি যেন চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সমস্যাটি কি?"

মোহন আমাদের দু'জনকে দুটি সিগারেট দিয়া, একটি নিজে ধরাইয়া বলিল,—"আপনারা ভাবছেন এমন গুণবান লোকের আর কোনো গুণ থাকা সম্ভব নয়—কেমন? কিন্তু তা নয়। এঁর আর একটি মস্ত গুণ আছে, এই শরীরের ওপর ইনি এক অদ্ভুত নেশা করেন।"

সিগারেটে গোটা দুই টান দিয়া বলিল,—"ব্যোমকেশ বাবু, আপনি

ত এই কাজের কাজী, সমাজের নিকৃষ্ট লোক নিয়েই আপনাকে কারবার করতে হয়—মদ, গাঁজা, চণ্ডু, কোকেন ইত্যাদি অনেক রকম নেশাই মানুষকে করতে দেখে থাকবেন; কিন্তু মাকড়্সার রস খেতে কাউকে দেখেছেন কি?"

আমি আঁৎকাইয়া উঠিয়া বলিলাম,—"মাকড়্সার রস! সে আবার কি?"

মোহন বলিল,—"এক জাতীয় মাকড়্সা আছে, যার শরীর থেকে এই বীভৎস বিষাক্ত রস পিষে বার করে নেওয়া হয়—"

ব্যোমকেশ কতকটা আত্মগত ভাবে বলিল,—"Tarantula dance! স্পেনে আগে ছিল,—এই মাকড়্সার কামড় খেয়ে হরদম নাচত! দারুণ বিষ! বইয়ে পড়েছি বটে কিন্তু এদেশে কাউকে ব্যবহার করতে দেখি নি।"

মোহন বলিল,—"ঠিক বলেছেন—ট্যারাণ্টুলা; সাউথ্ আমেরিকার স্প্যানিশ সঙ্কর জাতির মধ্যে এই নেশার খুব বেশী চলন আছে। এই ট্যারাণ্টুলার রস একটা তীব্র বিষ, কিন্তু খুব কম মাত্রায় ব্যবহার করলে শরীরের স্নায়ুমণ্ডলে একটা প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে। বুঝতেই পারছেন, স্বভাবের দোষে স্নায়বিক উত্তেজনা না হলে যারা থাকতে পারে না তাদের পক্ষে এই মাকড়্সার রস কি রকম লোভনীয় বস্তু। কিন্তু নিয়মিত ব্যবহার করলে এর ফল সাংঘাতিক দাঁড়ায়। স্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে স্নায়ুমণ্ডল ক্রমশ অসাড় হয়ে পড়ে এবং তার পরে মস্তিষ্কের পক্ষাঘাতে মৃত্যু অনিবার্য্য।"

"আমাদের নন্দদুলাল বাবু বোধ হয় যৌবনকালে এই চমৎকার নেশাটি ধরেছিলেন; তারপর শরীর যখন অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ল তখন নেশা ছাড়তে পারলেন না। আমি যখন গৃহ-চিকিৎসক হয়ে ওঁদের বাড়ীতে ঢুকলুম তখনো উনি প্রকাশ্যে ঐ নেশা চালাচ্ছেন, সে আজ বছরখানেকের

কথা। আমি প্রথমেই ওটা বন্ধ করে দিলুম,—বললুম, যদি বাঁচতে চান তা হলে ওটা ছাড়তে হবে।"

"এই নিয়ে খুব খানিকটা ধস্তাধস্তি হ'ল, তিনিও খাবেনই আমিও খেতে দেব না। শেষে আমি বললুম,—"আপনার বাড়ীতে ও জিনিস ঢুকতে দেব না, দেখি আপনি কি করে খান।" তিনিও কুটিল হেসে বললেন,—"তাই নাকি? আচ্ছা, আমিও খাব দেখি তুমি কি করে আট্‌কাও।" যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল।

"পরিবারের আর সকলে আমার পক্ষে ছিলেন, সুতরাং সহজেই বাড়ীর চারিদিকে কড়া পাহারা বসিয়ে দেওয়া গেল। তাঁর স্ত্রী ছেলেরা পালা করে তাঁকে পাহারা দিতে লাগলেন, যাতে কোনক্রমে সে-বিষ তাঁর কাছে পৌছতে না পারে। তিনি নিজে একরকম চলৎশক্তিহীন, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যে সে-জিনিস সংগ্রহ করবেন সে ক্ষমতা নেই। আমি এইভাবে তাঁকে আগ্‌লাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বেশ একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে লাগলুম।"

"কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না। এত কড়াকড়ি সত্ত্বেও বাড়ীসুদ্ধ লোকের নজর এড়িয়ে তিনি নেশা করতে লাগলেন; কোথা থেকে সে জিনিস আমদানি করছেন কেউ ধরতে পারলে না।"

"প্রথমটা আমার সন্দেহ হ'ল, হয় ত বাড়ীর কেউ লুকিয়ে তাঁকে সাহায্য করছে। তাই একদিন আমি নিজে সমস্তদিন পাহারায় রইলুম। কিন্তু আশ্চর্য্য মশায়, আমার চোখের সামনে তিন তিনবার সেই বিষ খেলেন। তাঁর নাড়ী দেখে বুঝলুম—অথচ কখন খেলেন ধরতে পারলুম না।"

"তারপর তাঁর ঘর আতিপাতি করেছি, তাঁর সঙ্গে বাইরের লোকের দেখা করা একেবারে বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু তবু তাঁর মৌতাত বন্ধ করতে পারি নি। এখনো সমভাবে সেই ব্যাপার চলছে।"

"এখন আমার সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই যে, লোকটা ওই মাকড়্সার রস পায় কোথা থেকে এবং পেলেও সকলের চোখে ধূলো দিয়ে খায় কি করে?"

মোহন চুপ করিল। ব্যোমকেশ শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল কিনা বলিতে পারি না, মোহন শেষ করিতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"অজিত, বাড়ী চল। একটা কথা হঠাৎ মাথায় এসেছে, যদি তা ঠিক হয় তা হলে—"

বুঝিলাম সেই পুরানো জালিয়াৎ আবার তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মোহন এতক্ষণ যে বকিয়া গেল তাহার শেষের দিকের কথাগুলা হয় ত তাহার কানেও যায় নাই। আমি একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলাম,—"মোহনের গল্পটা বোধ হয় তুমি ভাল করে শোনো নি—"

"বিলক্ষণ! শুনেছি বৈকি। সমস্যাটা খুবই মজার—কৌতূহলও হচ্চে—কিন্তু এখন কি আমার সময় হবে? আমি একটা বিশেষ শক্ত কাজে—"

মোহন মনে মনে বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হইল, কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল,—"তবে কাজ নেই থাক। আপনাকে এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামাতে অনুরোধ করা অবশ্য অনুচিত; কিন্তু কি জানেন, এর একটা নিষ্পত্তি হলে হয় ত লোকটার প্রাণ বাঁচাতে পারা যেত। একটা লোক—যতবড় পাপিষ্ঠই হোক—বিন্দু বিন্দু বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করছে চোখের সামনে দেখছি অথচ নিবারণ করতে পারছি না, এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হ'তে পারে?"

ব্যোমকেশ একটু লজ্জিত হইয়া বলিল,—"আমি করব না বলি নি ত। এ ধাঁধার উত্তর পেতে হ'লে ঘণ্টা দু'য়েক ভাবতে হবে; আর, একবার লোকটিকে দেখলেও ভাল হয়—কিন্তু আজ বোধ হয় তা পেরে উঠ্‌ব না। নন্দদুলাল বাবুর মত অসামান্য লোককে কিছুতেই মরতে দেওয়া যেতে

পারে না। সে আমি দেবোও না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু এখনি আমায় বাসায় ফিরতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে জালিয়াৎ লোকটিকে ধরে ফেলেছি। কিন্তু একবার কাগজগুলো ভাল করে দেখা দরকার। —সুতরাং আজকের রাতটা নন্দদুলাল বাবু নিশ্চিন্ত মনে বিষ পান করে নিন্—কাল থেকে আমি তাঁকে জব্দ করে দেব।"

মোহন হাসিয়া বলিল,—"বেশ, কালই হবে। কখন আপনার সুবিধা হবে বলুন—আমি 'কার' পাঠিয়ে দেব।"

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—"আচ্ছা, এক কাজ করা যাক্, তাতে আপনার উৎকণ্ঠাও অনেকটা লাঘব হবে। অজিত আজ আপনার সঙ্গে গিয়ে দেখে শুনে আসুক; তারপর ওর মুখে সব কথা শুনে আজ রাত্রেই কিম্বা কাল সকালে আমি আপনার ধাঁধার উত্তর দিয়ে দেব।"

ব্যোমকেশের বদলে আমি যাইব, ইহাতে মোহনের মুখে যে নিরাশার ভাব ফুটিয়া উঠিল তাহা কাহারো চক্ষু এড়াইবার নয়। ব্যোমকেশ তাহা দেখিয়া হাসিয়া বলিল,—"আপনার বাল্য-বন্ধু বলেই বোধ হয় অজিতের ওপর আপনার তেমন—ইয়ে—নেই। কিন্তু হতাশ হবেন না, সৎসঙ্গে পড়ে ওর বুদ্ধি এখন এমনি ভীষণ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে যে তার দু'একটা দৃষ্টান্ত শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।—হয় ত ও নিজেই আপনার এই ব্যাপারের সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটিত করে দেবে, আমাকে দরকারও হবে না।"

এত বড় সুপারিশেও মোহন বিন্দুমাত্র উৎসাহিত হইল না। রুই কাৎলা ধরিবার আশায় ছিপ্ ফেলিয়া যাহারা সন্ধ্যাকালে পুঁটিমাছ ধরিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহাদের মত মুখভাব করিয়া সে বলিল,—"অজিতই চলুক তা হলে। কিন্তু ও যদি না পারে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আর বলতে। তখন ত আমি আছিই।" ব্যোমকেশ আমাকে আড়ালে ডাকিয়া বলিল,—"সব জিনিস ভালো করে লক্ষ্য ক'রো,

আর চিঠিপত্র কি আসে খোঁজ নিও।”—এই বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

ব্যোমকেশকে অনেক জটিল রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতে দেখিয়াছি ও তাহাতে সাহায্য করিয়াছি। তাহার অনুসন্ধান পদ্ধতিও এতদিন একসঙ্গে থাকিয়া অনেকটা আয়ত্ত হইয়াছে। তাই মনে মনে ভাবিলাম, এই সামান্য ব্যাপারের কিনারা করিতে পারিব না? বিশেষ, আমার প্রতি মোহনের বিশ্বাসের অভাব দেখিয়া ভিতরে ভিতরে একটা জিদও চাপিয়াছিল, যেমন করিয়া পারি এ ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিব।

মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প আঁটিয়া মোহনের সহিত লেক হইতে বাহির হইলাম। বাস্ আরোহণে যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানের নিকট উপস্থিত হইলাম তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে—রাস্তার গ্যাস জ্বলিয়া উঠিতেছে। মোহন পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। সার্কুলার রোড হইতে একটা গলি ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর সম্মুখে একটা লোহার রেলিংযুক্ত বড় বাড়ী দেখাইয়া মোহন বলিল,—“এই বাড়ী।”

দেখিলাম সেকেলে ধরণের পুরাতন বাড়ী, সম্মুখে লোহার ফটকে টুল পাতিয়া দারোয়ান বসিয়া আছে। মোহনকে দেখিয়া সেলাম করিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু আমার প্রতি সন্দিগ্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—“বাবুজি, আপকো ভিতর যানা—”

মোহন হাসিয়া বলিল,—“ভয় নেই দারোয়ান, উনি আমার বন্ধু।”

“বহুত খুব”—দারোয়ান সরিয়া দাঁড়াইল; আমরা বাড়ীর সম্মুখস্থ অঙ্গনে প্রবেশ করিলাম।

অঙ্গন পার হইয়া বারান্দায় উঠিতেই ভিতর হইতে একটি বিশ-বাইশ বছরের যুবক বাহির হইয়া আসিল, বলিল,—“কে, ডাক্তারবাবু?”

আসুন।” আমার দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“ইনি—?”

মোহন তাহাকে একটু তফাতে লইয়া গিয়া নিম্নকণ্ঠে কি বলিল, যুবকও উত্তর দিল,—“বেশ ত, বেশ ত, উনি আসুন না—”

মোহন তখন পরিচয় করাইয়া দিল—গৃহস্বামীর জ্যেষ্ঠপুত্র, নাম অরুণ। তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। দুইটা ঘর অতিক্রম করিয়া তৃতীয় ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতেই ভিতর হইতে একটা কলহ—তীক্ষ্ণ ভাঙা কণ্ঠস্বর শুনা গেল,—“কে? কে তুমি? এখন আমায় বিরক্ত ক’রো না আমি লিখ্ছি।

অরুণ বলিল,—“বাবা, ডাক্তার বাবু এসেছেন। অভয়, দোর খোল।” একটি আটারো উনিশ বছর বয়সের যুবক—বোধ হয় গৃহস্বামীর দ্বিতীয় পুত্র—দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা সকলে ঘরে প্রবেশ করিলাম।

অরুণ চুপি চুপি অভয়কে জিজ্ঞাসা করিল,—“খেয়েছেন?”

অভয় ম্লান ভাবে ঘাড় নাড়িল।

ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে দৃষ্টি পড়িল, ঘরের মধ্যস্থলে খাটের উপর বিছানা পাত্রা রহিয়াছে এবং সেই বিছানায় বালিশ ঠেস্ দিয়া বসিয়া, ডান হাতে উত্থিত কলম ধরিয়া, অতি শীর্ণকায় নন্দদুলাল বাবু ক্রুদ্ধ কষায়িত নেত্রে আমাদের দিকে চাহিয়া আছেন। মাথার উপর উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলিতেছিল, আর একটা টেবল্-ল্যাম্প্ খাটের ধারে উঁচু টিপাইয়ের উপর রাখা ছিল; তাই লোকটির সমস্ত অবয়ব ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। তাঁহার বয়স বোধ করি পঞ্চাশের নীচেই, কিন্তু মাথার চুল সমস্ত পাকিয়া একটা শ্রীহীন পাঁশুটে বর্ণ ধারণ করিয়াছে। হাড় চওড়া, ধারালো মুখে মাংসের লেশমাত্র নাই, হনুর অস্থি দুটা যেন চর্ম্ম ভেদ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে—পাৎলা দ্বিধা ভগ্ন নাকটা মুখের উপর শুঁড়ের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। চোখ দুটা কোনো অস্বাভাবিক উত্তেজনার ফলে

অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু উত্তেজনার অবসানে আবার যে তাহারা মৎস্যচক্ষুর মত ভাবলেশহীন হইয়া পড়িবে তাহার আভাসও সে চক্ষে লুক্কায়িত আছে। নিম্নের ঠোঁট শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সব মিলিয়া মুখের উপর একটা কদাকার ক্ষুদিত অসন্তোষ যেন রেখায় রেখায় চিহ্নিত হইয়া আছে।

কিছুক্ষণ এই প্রেতাকৃতি লোকটির দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিয়া থাকিয়া দেখিলাম, তাঁহার বাঁ হাতটা থাকিয়া থাকিয়া অকারণে আনর্ত্তিত হইয়া উঠিতেছে, যেন সেটা স্বাধীন ভাবে, দেহ হইতে সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইয়া নৃত্য সুরু করিয়া দিয়াছে। মৃত ব্যাঙের দেহ তড়িৎ সংস্পর্শে চমকাইয়া উঠিতে যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই স্নায়ু-নৃত্য কতকটা আন্দাজ করিতে পারিবেন।

নন্দদুলাল বাবুও বিষদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকাইয়া ছিলেন, সেই ভাঙা অথচ তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তার! এ আবার কাকে নিয়ে এসেছ এখানে? কি চায় লোকটা? যেতে বল—যেতে বল—"

মোহন চোখের একটা ইসারা করিয়া আমাকে জানাইল যে আমি যেন গৃহস্বামীর এরূপ সম্ভাষণে কিছু মনে না করি; তারপর শয্যার উপর হইতে বিক্ষিপ্ত কাগজগুলা সরাইয়া শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া রোগীর নাড়ী হাতে লইয়া স্থির হইয়া দেখিতে লাগিল। নন্দদুলাল বাবু মুখে একটা বিকৃত হাস্য লইয়া একবার আমার পানে একবার ডাক্তারের পানে তাকাইতে লাগিলেন। বাঁ হাতটা তেমনি নৃত্য করিতে লাগিল।

শেষে হাত ছাড়িয়া দিয়া মোহন বলিল,—"আবার খেয়েছেন?"

"বেশ করেছি—কার বাবার কি?"

মোহন অধর দংশন করিল, তারপর বলিল,—"এতে নিজেরই কেবল ক্ষতি করছেন, আর কারু নয়। কিন্তু সে ত আপনি বুঝবেন না, বোঝবার ক্ষমতাই নেই। ঐ বিষ খেয়ে খেয়ে মস্তিষ্কের দফা রফা করে ফেলেছেন।"

নন্দদুলাল বাবু মুখের একটা পৈশাচিক বিকৃতি করিয়া বলিলেন,—"তাই নাকি এয়ার ? মস্তিষ্কের দফারফা করে ফেলেছি। কিন্তু তোমার ঘটে ত অনেক বুদ্ধি আছে ? তবে ধর্‌তে পারছ না কেন ? বলি, চারদিকে ত সেপাই বসিয়ে দিয়েছ,—কৈ ধরতে পারলে না ?"—বলিয়া হি হি করিয়া এক অশ্রাব্য হাসি হাসিতে লাগিলেন।

মোহন বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"আপনার সঙ্গে কথা কওয়াই ঝকমারী। যা করছিলেন করুন।"

নন্দদুলাল বাবু পূর্ব্ববৎ হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—দুয়ো ডাক্তার দুয়ো। আমায় ধরতে পারলে না ধিনতা ধিনা পাকা নোনা—" সঙ্গে সঙ্গে দুই হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলিয়া নাড়িতে লাগিলেন।

নিজের পুত্রদের সম্মুখে এই কদর্য্য অসভ্যতা আমার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল; মোহনেরও বোধ করি ধৈর্য্যের বন্ধন ছিঁড়িবার উপক্রম করিতেছিল, সে আমাকে বলিল,"নাও অজিত, কি দেখবে দেখে শুনে নাও—আর পারা যায় না।"

হঠাৎ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ আস্ফালন থামাইয়া নন্দদুলাল বাবু দুই সর্প-চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া কটুকণ্ঠে কহিলেন,—"কে হে তুমি—আমার বাড়ীতে কোন্ মৎলবে ঢুকেছ ? আমি কোন জবাব দিলাম না, তখন—চালাকি করবার আর জায়গা পাও নি ? ওসব ফন্দি ফিকির এখানে চলবে না যাদু—বুঝেছ ? এইবেলা চটপট সরে পড়, নইলে পুলিস ডাকব।—যত সব নচ্ছার ছিঁচ্‌কে চোরের দল। বলিয়া মোহনকেও নিজের দৃষ্টির মধ্যে সাপ্টাইয়া লইলেন। সে আমাকে কি উদ্দেশ্যে আনিয়াছে ঠিক না বুঝিলেও আমার উপর তাঁহার ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছিল।

অরুণ লজ্জিত ভাবে আমার কানে কানে বলিল,—"ওঁর কথায় কান দেবেন না! ওটা খেলে ওঁর আর জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না।"

মনে মনে ভাবিলাম, কি ভয়ঙ্কর এই বিষ যাহা মানুষের সমস্ত গোপন

দুষ্প্রবৃত্তিকে এমন উগ্র প্রকট করিয়া তুলে! যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া ইহা খায় তাহার নৈতিক অধোগতির মাত্রাই বা কে নিরূপণ করিবে?

ব্যোমকেশ বলিয়াছিল সব দিক ভাল করিয়া লক্ষ্য করিতে, তাই যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি ঘরের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া লইলাম। ঘরটা বেশ বড়, আসবার-পত্রও অধিক নাই,—একটা খাট, গোটা দুই তিন চেয়ার, একটা আলমারি ও একটা তেপায়া টেবল। এই টেবলের উপর ল্যাম্পটা রাখা আছে এবং তাহারি পাশে কয়েক দিস্তা অলিখিত কাগজ ও অন্যান্য লেখার সরঞ্জাম রহিয়াছে। লিখিত কাগজগুলা অবিন্যস্ত ভাবে চারিদিকে ছড়ানো। আমি এক তা কাগজ তুলিয়া লইয়া কয়েক ছত্র পড়িয়াই শিহরিয়া রাখিয়া দিলাম;—মোহন যাহা বলিয়াছিল তাহা সত্য। এ লেখা পড়িলে ফরাসী বস্তুতান্ত্রিক এমিল্ জোলারও বোধ করি গা ঘিন্ ঘিন্ করিত। শুধু তাই নয়, লেখার বিশেষ রসালো স্থলগুলিতে লালকালীর দাগ দিয়া লেখকমহাশয় সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। বস্তুত, এতখানি নোংরা জঘন্য মনের পরিচয় আর কোথাও পাইয়াছি বলিয়া স্মরণ হইল না।

নন্দদুলাল বাবুর দিকে একটা ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তিনি আবার লেখায় মন দিয়াছেন; পার্কারের কলম দ্রুতবেগে কাগজের উপর সঞ্চরণ করিয়া চলিয়াছে, পাশের টেবলে দোয়াতদানীতে আর একটা মেটে লাল রঙের পার্কারের ফাউণ্টেন পেন্ রাখা আছে, লেখা শেষ হইলেই বোধ করি দাগ দেওয়া আরম্ভ হইবে।

হইলও তাই। পাতাটা শেষ হইতেই নন্দদুলাল বাবু কালো কলম রাখিয়া লাল কলমটা তুলিয়া হইলেন। আঁচড় কাটিয়া দেখিলেন কালী ফুরাইয়া গিয়াছে—তখন টেবলের উপর হইতে লাল কালীর চ্যাপ্টা শিশি লইয়া তাহাতে কালী ভরিলেন, তারপর গম্ভীর ভাবে নিজের লেখার মণি-মুক্তাগুলি চিহ্নিত করিতে লাগিলেন।

আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া ঘরের অন্যান্য জিনিস দেখিতে লাগিলাম। আলমারিটাতে কিছু ছিল না, শুধু কতকগুলা অর্দ্ধেক শূন্য ঔষধের শিশি পড়িয়া ছিল। মোহন বলিল, সেগুলা তাহারই প্রদত্ত ঔষধ। ঘরে দুটি জানালা, দুটি দরজা। একটি দরজা দিয়া আমরা প্রবেশ করিয়াছিলাম, অন্যটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ওদিকে স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। সে ঘরটাও দেখিলাম! বিশেষ কিছু নাই, কয়েকটা কাচা কাপড় তোয়ালে, তেল, সাবান, মাজন ইত্যাদি রহিয়াছে।

জানালা দুটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, বাহিরের সহিত উহাদের কোনো যোগ নাই, তা ছাড়া অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে।

ব্যোমকেশ থাকিলে কি ভাবে অনুসন্ধান করিত তাহা কল্পনা কবিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। দেয়ালে টোকা মারিয়া দেখিব কি না ভাবিতেছি—হয় ত কোথাও গুপ্ত দরজা আছে—এমন সময় চোখে পড়িল দেয়ালে একটা তাকের উপর একটি চাঁদির আতরদানি রহিয়াছে। সাগ্রহে সেটাকে পরীক্ষা করিলাম; তাহার মধ্যে খানিকটা তুলা ও খোপে খোপে আতর রহিয়াছে। চুপি চুপি অরুণকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"উনি আতর মাখেন নাকি?"

সে অনিশ্চিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"কি জানি। বোধহয় না, মাখলে গন্ধ পাওয়া যেত।"

"এটা কতদিন এঘরে আছে?"

"তা বরাবরই আছে। বাবাই ওটা আনিয়ে ঘরে রেখেছিলেন।"

ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, লেখা বন্ধ করিয়া নন্দদুলাল বাবু এইদিকেই তাকাইয়া আছেন। মন উত্তেজিত হইয়া উঠিল; খানিকটা তুলা আতরে ভিজাইয়া পকেটে পুরিয়া লইলাম।

তারপর ঘরের চারিদিকে একবার শেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির

হইয়া আসিলাম। নন্দদুলাল বাবুর দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করিল; দেখিলাম তাঁহার মুখে সেই শ্লেষপূর্ণ কদর্য্য হাসিটা লাগিয়া আছে।

বাহিরে আসিয়া আমরা বারান্দায় বসিলাম। আমি বলিলাম,—"এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই, কোনো কথা গোপন না করে উত্তর দেবেন।"

অরুণ বলিল,—"বেশ, জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম,—"আপনারা ওঁকে সর্ব্বদা নজরবন্দীতে রেখেছেন? কে কে পাহারা দেয়?"

"আমি অভয় আর মা পালা করে ওঁর কাছে থাকি। চাকর বাকর বা অন্য কাউকে কাছে যেতে দিই না।"

"ওঁকে কখনও ও জিনিস খেতে দেখেছেন।"

"না—মুখে দিতে দেখি নি। তবে খেয়েছেন তা জানতে পেরেছি।"

"জিনিসটার চেহারা কি রকম কেউ দেখেছেন?"

"যখন প্রকাশ্যে খেতেন তখন দেখেছিলুম—জলের মত জিনিস, হোমিওপ্যাথিক শিশিতে থাকত; তাই কয়েক ফোঁটা সরবৎ কিম্বা অন্য কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে খেতেন।"

"সে রকম শিশি ঘরে কোথাও নেই—ঠিক জানেন?"

"ঠিক জানি। আমরা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি।"

"তা হলে নিশ্চয় বাইরে থেকে আসে। কে আনে?"

অরুণ মাথা নাড়িল,—"জানি না।"

"আপনারা তিন জন ছাড়া আর কেউ ও ঘরে ঢোকে না? ভাল করে ভেবে দেখুন।"

"না—কেউ না। এক ডাক্তার বাবু ছাড়া।"

আমার জেরা ফুরাইয়া গেল—আর কি জিজ্ঞাসা করিব? গালে হাত

দিয়া ভাবিতে ভাবিতে ব্যোমকেশের উপদেশ স্মরণ হইল; পুনশ্চ আরম্ভ করিলাম,—"ওঁর কাছে কোনো চিঠি পত্র আসে ?"

"না।"

"কোনো পার্সেল কি অন্য রকম কিছু ?"

এইবার অরুণ বলিল,—"হ্যাঁ, হপ্তায় একখানা করে রেজেষ্ট্রী চিঠি আসে।"

আমি উৎসাহে লাফাইয়া উঠিলাম,—"কোত্থেকে আসে? কে পাঠায় ?"

লজ্জায় ঘাড় নীচু করিয়া অরুণ আস্তে আস্তে বলিল,—"কলকাতা থেকেই আসে—রেবেকা লাইট নামে একজন স্ত্রীলোক পাঠায়।"

আমি বলিলাম,—"হুঁ, বুঝেছি। চিঠিতে কি থাকে আপনারা দেখেছেন কি ?"

"দেখেছি।" বলিয়া অরুণ মোহনের পানে তাকাইল।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি থাকে ?"

"শাদা কাগজ।"

"শাদা কাগজ ?

"হ্যাঁ খালি কতকগুলো শাদা কাগজ খামের মধ্যে পোরা থাকে—আর কিছু না।"

আমি হতবুদ্ধির মত প্রতিধ্বনি করিলাম,—"আর কিছু না ?"

"না।"

কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া রহিলাম; শেষে বলিলাম,—"ঠিক জানেন খামের ভিতর আর কিছু থাকে না।"

অরুণ একটু হাসিয়া বলিল,—"ঠিক জানি। বাবা নিজে পিওনের সামনে রসিদ দস্তখত করে চিঠি নেন বটে কিন্তু আগে আমিই চিঠি খুলি। তাতে শাদা কাগজ ছাড়া আর কিছুই থাকে না।"

"প্রত্যেক বার আপনিই চিঠি খোলেন ? কোথায় খোলেন ?"

"বাবার ঘরে। সেই খানেই পিওন চিঠি নিয়ে যায় কিনা।"

"কিন্তু এ ত ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার! শাদা কাগজ রেজিষ্ট্রি ক'রে পাঠাবার মানে কি?"

মাথা নাড়িয়া অরুণ বলিল,—"জানি না।"

আরো কিছুক্ষণ বোকার মত বসিয়া থাকিয়া শেষে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া পড়িলাম। রেজিষ্ট্রি চিঠির কথা শুনিয়া মনে আশা হইয়াছিল যে ফন্দিটা বুঝি ধরিয়া ফেলিয়াছি—কিন্তু না, ওদিকের দরজায় একেবারে তালা লাগানো। বুঝিলাম, আপাত-দৃষ্টিতে ব্যাপার সামান্য ঠেকিলেও, আমার বুদ্ধিতে কুলাইবে না। 'তূলা শুনিতে নরম কিন্তু ধুনিতে লবেজান।' ঐ বিষজর্জ্জরিতদেহ অকালপঙ্গু বুড়া লম্পটকে আঁটিয়া ওঠা আমার কর্ম্ম নয়,—এখানে ব্যোমকেশের সেই শাণিত ঝক্‌ঝকে মস্তিষ্কটি দরকার।

মলিন মুখে, ব্যোমকেশকে সকল কথা জানাইব বলিয়া বাহির হইতেছি, একটা কথা স্মরণ হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"নন্দদুলাল বাবু কাউকে চিঠি পত্র লেখেন?"

অরুণ বলিল,—"না, তবে মাসে মাসে মণি অর্ডার করে টাকা পাঠান।"

"কাকে পাঠান?"

লজ্জাম্লান মুখে অরুণ বলিল,—"ঐ ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে।"

মোহন ব্যাখ্যা করিয়া বলিল,—"ঐ স্ত্রীলোকটা আগে নন্দদুলাল বাবুর—'

"বুঝেছি। কত টাকা পাঠান।"

"এক শ' টাকা। কিন্তু কেন পাঠান তা বলতে পারি না।"

মনে মনে ভাবিলাম—পেন্‌সন্। কিন্তু মুখে সে-কথা না বলিয়া একাকী বাহির হইয়া পড়িলাম। মোহন রহিয়া গেল।

বাসায় পৌঁছিতে রাত্রি আটটা বাজিল।

ব্যোমকেশ লাইব্রেরি ঘরে ছিল, দ্বারে ধাক্কা দিতেই কবাট খুলিয়া বলিল,—"কি খবর? সমস্যা-ভঞ্জন হ'ল?"

"না"—আমি ঘরে ঢুকিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। ইতিপূর্ব্বে ব্যোমকেশ একটা মোটা লেন্স্ লইয়া একখণ্ড কাগজ পরীক্ষা করিতেছিল এখন আবার যন্ত্রটা তুলিয়া লইল। তারপর আমার দিকে একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানিয়া বলিল,—"ব্যাপার কি? এত সৌখীন হয়ে উঠ্‌লে কবে থেকে? আতর মেখেছ যে?"

"মাখি নি। নিয়ে এসেছি।" তাহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বর্ণনা করিয়া শুনাইলাম, সেও বোধ হইল মন দিয়া শুনিল। উপসংহারে আমি বলিলাম,—"আমার দ্বারা ত হ'ল না ভাই—এখন দেখ, তুমি যদি কিছু পার। তবে আমার মনে হয়, এই আতরটা অ্যানালাইজ করলে কিছু পাওয়া যেতে পারে—"

"কি পাওয়া যাবে—মাকড়সার রস?"—ব্যোমকেশ আমার হাত হইতে তুলাটা লইয়া তাহার আঘ্রাণ গ্রহণ করিয়া বলিল,—"আঃ! চমৎকার গন্ধ! খাঁটি অম্বুরি আতর। তুলাটা হাতের চামড়ার উপর ঘষিতে ঘষিতে বলিল,—"হ্যাঁ—কি বল্‌ছিলে? কি পাওয়া যেতে পারে?"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম,—"হয় ত নন্দদুলাল বাবু আতর মাখ্‌বার ছল ক'রে—"

ব্যোমকেশ হাসিয়া উঠিল,—"এক মাইল দূর থেকে যার গন্ধ পাওয়া যায় সে জিনিস কেউ লুকিয়ে ব্যবহার করতে পারে? নন্দদুলাল বাবু যে আতর মাখেন তার কোনো প্রমাণ পেয়েছ?"

"তা পাই নি বটে—কিন্তু—"

"না হে না, ওদিকে নয়, অন্যদিকে সন্ধান কর। কি করে জিনিবটা ঘরের মধ্যে আসে, কি করে নন্দদুলাল বাবু সকলের চোখের সাম্‌নে সেটা

মুখে দেন—এই সব কথা ভেবে দেখ। রেজেষ্ট্রি ক'রে শাদা কাগজ কেন আসে? ঐ স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয় কেন? ভেবে দেখেছ?"

আমি হতাশ ভাবে বলিলাম,—"অনেক ভেবেছি, কিন্তু আমার দ্বারা হ'ল না।"

"আরো ভাবো—কষ্ট না করলে কি কেষ্ট পাওয়া যায়?—গভীর ভাবে ভাবো, একাগ্রচিত্তে ভাবো, নাছোড়বান্দা হয়ে ভাবো—" বলিয়া সে আবার লেন্স্‌টা তুলিয়া লইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আর তুমি?"

"আমিও ভাব্‌ছি। কিন্তু একাগ্রচিত্তে ভাবা বোধ হয় হয়ে উঠ্‌বে না। আমার জালিয়াৎ—" বলিয়া সে টেবলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

আমি ঘর হইতে উঠিয়া আসিয়া আমাদের বসিবার ঘরে আরাম কেদারাটায় লম্বা হইয়া শুইয়া আবার ভাবিতে আরম্ভ করিলাম। সত্যই ত, কি এমন কঠিন কাজ যে আমি পারব না। নিশ্চয় পারব।

প্রথমতঃ রেজিষ্ট্রি করিয়া শাদা কাগজ আসিবার সার্থকতা কি? অদৃশ্য কালী দিয়া তাহাতে কিছু লেখা থাকে? যদি তাই থাকে, তাহাতে নন্দদুলাল বাবুর কি সুবিধা হয়? জিনিসটা ত তাঁহার কাছে পৌঁছিতে পারে না।

আচ্ছা, ধরিয়া লওয়া যাক, জিনিসটা কোনোক্রমে বাহির হইতে ঘরের ভিতরে আসিয়া পৌঁছিল; কিন্তু সেটা নন্দদুলাল বাবু রাখেন কোথায়? হোমিওপ্যাথিক ঔষধের শিশিও লুকাইয়া রাখা সহজ কথা নয়। অষ্ট-প্রহর সতর্ক চক্ষু তাঁহাকে ঘিরিয়া আছে, তাহার উপর প্রত্যহ খানাতল্লাসী চলিতেছে। তবে?

ভাবিতে ভাবিতে মাথা গরম হইয়া উঠিল, পাঁচটা চুরুট পুড়িয়া ভস্মীভূত হইয়া গেল,—কিন্তু একটা প্রশ্নেরও উত্তর পাইলাম না। নিরাশ হইয়া প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছি এমন সময় একটা অপূর্ব্ব আইডিয়া মাথায় ধরিয়া গেল। ধড়মড় করিয়া আরাম কেদারায় উঠিয়া বসিলাম।

এও কি সম্ভব! কিম্বা—সম্ভব নয়ই বা কেন? শুনিতে একটু অস্বাভাবিক ঠেকিলেও—এ ছাড়া আর কি হইতে পারে? ব্যোমকেশ বলিয়াছে, কোনো বিষয়ের যুক্তি-সম্মত প্রমাণ যদি থাকে অথচ তাহা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তবু তাহা সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। এ ক্ষেত্রেও ইহাই ত এ সমস্যার একমাত্র সমাধান।

ব্যোমকেশকে বলিব মনে করিয়া উঠিয়া যাইতেছি, ব্যোমকেশ নিজেই আসিয়া প্রবেশ করিল; আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—"কি? ভেবে বার করলে না কি?"

"বোধ হয় করেছি।"

"বেশ বেশ। কি বার করলে শুনি?"

বলিতে গিয়া একটু বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল, তবু জোর করিয়া সঙ্কোচ সরাইয়া বলিলাম,—"দেখ, নন্দদুলাল বাবুর ঘরের দেওয়ালে কতকগুলো মাকড়্সা দেখেছি, এখন মনে পড়ল। আমার বিশ্বাস তিনি সেই গুলোকে—"

"ধরে ধরে খান্!"—ব্যোমকেশ হো হো করিয়া উচ্চরবে হাসিয়া উঠিল, "অজিত, তুমি একেবারে একটি—জিনিয়াস! তোমার জোড়া নেই। দেয়ালের মাকড়্সা ধরে ধরে খেলে নেশা হবে না ভাই, গা-ময় গরলের ঘা ফুটে বেরুবে। বুঝলে?"

আমি উত্তপ্ত হইয়া বলিলাম,—"বেশ, তবে তুমিই বল।"

ব্যোমকেশ চেয়ারে বসিয়া টেবলের উপর পা তুলিয়া দিল। অলসভাবে একটা চুরুট ধরাইতে ধরাইতে বলিল,—"শাদা কাগজ ডাকে কেন আসে বুঝতে পেরেছ?"

"না।"

"ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে কেন টাকা পাঠানো হয় বুঝেছ?"

"না।"

"নন্দদুলাল বাবু দিবারাত্রি অশ্লীল গল্প লেখেন কেন তাও বুঝতে পারনি?"

"না। তুমি বুঝেছ ?"

"বোধ হয় বুঝেছি," ব্যোমকেশ চুরুটে দীর্ঘ টান দিয়া নিমীলিত নেত্রে কহিল,—"কিন্তু একটা বিষয়ে নিঃসন্দেহভাবে না-জানা পর্য্যন্ত মন্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন হবে না।"

"কি বিষয়ে ?"

ব্যোমকেশ মুদিতচক্ষে বলিল,—"আগে জানা দরকার নন্দদুলাল বাবুর জিভ কোন্ রঙের।"

মনে হইল ব্যোমকেশ আমাকে পরিহাস করিতেছে, রুষ্ট মুখে বলিলাম,—"ঠাট্টা হচ্চে বুঝি ?"

"ঠাট্টা !" ব্যোমকেশ চোখ খুলিয়া আমার মুখের ভাব দেখিয়া বলিল, —"রাগ করলে ? সত্যি বলছি ঠাট্টা নয়। নন্দদুলাল বাবুর জিভের রঙের ওপরেই সব নির্ভর করছে। যদি তাঁর জিভের রঙ লাল হয় তা হলে বুঝব আমার অনুমান ঠিক, আর যদি না হয়—। তুমি বোধ হয় লক্ষ্য কর নি ?"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম,—"না, জিভ লক্ষ্য করবার কথা আমার মনে হয় নি।"

ব্যোমকেশ সহাস্যে বলিল,—"অথচ ঐটেই আগে মনে হওয়া উচিত ছিল। যাহোক, এক কাজ কর, ফোন ক'রে নন্দদুলাল বাবুর ছেলের কাছ থেকে খবর নাও।"

"রসিকতা করছি মনে করবে না ত ?"

ব্যোমকেশ হাত নাড়িয়া কাব্যের ভাষায় বলিল,—"ভয় নাই তোর, ভয় নাই ওরে ভয় নাই—কিছু নাই তোর ভাবনা—"

পাশের ঘরে গিয়া নম্বর খুঁজিয়া ফোন করিলাম। মোহন তখনো সেখানে ছিল, সেই উত্তর দিল,—"নন্দদুলাল বাবুর জিভের রঙ টক্‌টকে লাল। কারণ তিনি বেশী পান খান।—কেন বল দেখি ?"

ব্যোমকেশকে ডাকিলাম, ব্যোমকেশ আসিয়া বলিল,—"লাল ত ?"

তবে আর কি—হয়ে গেছে।—দেখি।" আমার হাত হইতে ফোন লইয়া বলিল,—"ডাক্তার বাবু ? ভালই হ'ল। আপনার ধাঁধার উত্তর পাওয়া গেছে। হ্যাঁ, অজিতই ভেবে বার করেছে—আমি একটু সাহায্য করেছি মাত্র। আমার জালিয়াৎ নিয়ে ব্যস্ত ছিলুম তাই—হ্যাঁ, জালিয়াৎকে ধরেছি। বিশেষ কিছু করতে হবে না, কেবল নন্দদুলাল বাবুর ঘর থেকে লাল কালীর দোয়াত আর লাল রঙের ফাউণ্টেন পেন্‌টা সরিয়ে দেবেন। হ্যাঁ—ঠিক ধরেছেন। কাল একবার আসবেন তখন সব কথা বল্‌ব—আচ্ছা, নমস্কার। অজিতকে আপনাদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাবো। বলেছিলুম কিনা—যে ওর বুদ্ধি আজকাল ভীষণ ধারালো হয়ে উঠেছে ?" হাসিতে হাসিতে ব্যোমকেশ ফোন রাখিয়া দিল।

বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিয়া লজ্জিত মুখে বলিলাম,—"কতক-কতক যেন বুঝতে পারছি; কিন্তু তুমি সব কথা পরিষ্কার করে বল। কেমন করে বুঝলে ?"

ঘড়ির দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যোমকেশ বলিল,—"খাবার সময় হ'ল, এখনি পুঁটিরাম ডাকতে আসবে। আচ্ছা চটপট ব'লে নিচ্চি শোনো।—প্রথম থেকেই তুমি ভুল পথে যাচ্ছিলে। দেখতে হ'বে জিনিসটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে কি ক'রে। তার নিজের হাত পা নেই, সুতরাং কেউ তাকে নিশ্চয় নিয়ে আসে। কে সে ? ঘরের মধ্যে পাঁচজন লোক ঢুকতে পায়,—ডাক্তার, দুই ছেলে, স্ত্রী এবং আর এক জন। প্রথম চারজন বিষ খাওয়াবে না এটা নিশ্চিত, অতএব ও পঞ্চম ব্যক্তির কাজ।"

"পঞ্চম ব্যক্তি কে ?"

"পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে—পিওন। সে হপ্তায় একবার সই করবার জন্যে নন্দদুলাল বাবুর ঘরে ঢোকে। সুতরাং তার মারফতেই জিনিসটা ঘরে প্রবেশ করে।"

"কিন্তু খামের মধ্যে ত সাদা কাগজ ছাড়া আর কিছু থাকে না।"

"ঐখানেই ফাঁকি। সবাই মনে করে খামের মধ্যে জিনিসটা আছে, তাই পিওনকে কেউ লক্ষ্য করে না। লোকটা হুঁসিয়ার, সে অনায়াসে লাল কালীর দোয়াত বদ্‌লে দিয়ে চলে যায়। রেজিষ্ট্রি ক'রে শাদা কাগজ পাঠাবার উদ্দেশ্য হচ্ছে, কোনো ক্রমে পিওনকে নন্দদুলাল বাবুর ঘরে ঢোকবার অবকাশ দেওয়া।"

"তারপর?"

"তুমি আর একটা ভুল করেছিলে; ইহুদি স্ত্রীলোকটাকে টাকা পাঠানো হয়—পেন্‌সন্‌ স্বরূপ নয়, ও প্রথা কোথাও প্রচলিত নেই—টাকাটা ওষুধের দাম, ওই মাগিই পিওনের হাতে ওষুধ সরবরাহ করে।"

"তা হলে দেখ ওষুধ নন্দদুলাল বাবুর হাতের কাছে এসে পৌছল, কেউ জানতে পারলে না। কিন্তু অষ্টপ্রহর ঘরে লোক থাকে, তিনি খাবেন কি করে? নন্দদুলাল বাবু গল্প লিখতে আরম্ভ করলেন। সর্ব্বদাই হাতের কাছে লেখার সরঞ্জাম রয়েছে, তাই উঠে গিয়ে খাবারও দরকার নেই—খাটের ওপর বসেই সে কার্য্য সম্পন্ন করা যায়। তিনি কালো কলম দিয়ে গল্প লিখছেন, লাল কলম দিয়ে তাতে দাগ দিচ্ছেন এবং একটু ফাঁক পেলেই কলমের নিবটি চুষে নিচ্ছেন। কালী ফুরিয়ে গেলে আবার ফাউণ্টেন্‌ পেন্‌ ভরে নিচ্ছেন। জিভের রঙ লাল কেন এখন বুঝ্‌তে পারছ?"

"কিন্তু লালই যে হবে তা বুঝলে কি করে? কালোও ত হতে পারত?"

"হায় হায় এটা বুঝলে না। কালো কালী যে বেশী খরচ হয়। নন্দদুলাল বাবু ঐ অমূল্যনিধি কি বেশী খরচ হতে দিতে পারেন? তাই লাল কালীর ব্যবস্থা।"

"বুঝেছি। এত সহজ—"

"সহজ ত বটেই। কিন্তু যে-লোকের মাথা থেকে এই সহজ বুদ্ধি বেরিয়েছে তার মাথাটা অবহেলার বস্তু নয়। এত সহজ বলেই তোমরা ধরতে পারছিলে না।"

"তুমি ধরলে কি করে?"

"খুব সহজে। এই ব্যাপারে দুটো জিনিস সম্পূর্ণ নিরর্থক বলে মনে হয়,—এক, রেজিষ্ট্রি করে শাদা কাগজ আসা; দুই, নন্দদুলাল বাবুর গল্প লেখা। এই দুটোর সত্যিকার কারণ খুঁজতে গিয়েই আসল কথাটি বেরিয়ে পড়ল।"

পাশের ঘরে ঝন্ ঝন্ করিয়া টেলিফোনের ঘণ্টি বাজিয়া উঠিল, আমরা দুজনেই তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাম। ব্যোমকেশ ফোন ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কে আপনি? ও—ডাক্তারবাবু, কি খবর?……নন্দদুলাল বাবু চেঁচামেচি করছেন?………হাত পা ছুড়ছেন? তা হোক, তা হোক, তাতে কোনো ক্ষতি হবে না।……অ্যাঁ! কি বললেন? অজিতকে গালাগাল দিচ্ছেন? শকার বকার তুলে?………ভারি অন্যায়। ভারি অন্যায় কিন্তু—যখন তাঁর মুখ বন্ধ করা যাচ্ছে না তখন আর উপায় কি?………অজিত অবশ্য ওসব গ্রাহ্য করে না; অবিমিশ্র প্রশংসা যে পৃথিবীতে পাওয়া যায় না তা সে জানে। মধু ও হুল—কমলে কণ্টক…এই জগতের নিয়ম…আচ্ছা নম

শেষ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬